প্রকাশনার ৩৬ বছর

অগ্রপথিক

এপ্রিল ২০২১

বাংলা নববর্ষ সংখ্যা

প্রকাশনার ৩৬ বছর

অগ্রপথিক

সৃ জ ন শী ল মা সি ক

ছত্রিশ বর্ষ ❑ সংখ্যা ০৪
এপ্রিল ২০২১ ॥ চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৭ ॥ শাবান-রমযান ১৪৪২

প্রধান সম্পাদক
ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান

সম্পাদক
মোহাম্মদ আনোয়ার কবির

প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭

অগ্রপথিক

নিয়মাবলী

- অগ্রপথিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সৃজনশীল মাসিক মুখপত্র।
- ইসলামের সুমহান জীবনাদর্শ প্রচার ও প্রসারে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, জীবনী, তথ্যমূলক ফিচারসহ সৃজনশীল লেখকদের গল্প, কবিতা, নাটক, স্মৃতিকথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি,শিল্পকলা, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক লেখা প্রকাশ এবং মননশীল পাঠক তৈরি করা অগ্রপথিকের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বিশ্ব মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।
- উদ্দেশ্যের অনুকূলে যে কেউ তাঁর নির্বাচিত মূল্যবান লেখাটি অগ্রপথিক-এ প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে অবশ্যই স্পষ্ট ও নির্ভুল হতে হবে। কাগজের দুই পৃষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য নয়। অগ্রপথিক-এর ই- মেইল ঠিকানায়ও লেখা পাঠাতে পারেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না। প্রকাশিত লেখার সম্মানী দেয়া হয়। লেখা সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখা (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) সহ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে অগ্রপথিকসহ অন্যান্য প্রকাশনা কিনতে পাওয়া যায়।

প্রচ্ছদ
ফারজীমা মিজান শরমীন

মূল্য : ২০ টাকা

যোগাযোগ
সম্পাদক
অগ্রপথিক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫১৯
E-mail : ifa.agropothik@gmail.com

স ম্পা দ কী য়

পবিত্র মাহে রমযান

খোশ আমদেদ পবিত্র মাহে রমযান। মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের মুক্তির জন্য যে কয়েকটি বিশেষ মাস রেখেছেন তার অন্যতম পবিত্র মাহে রমযান। এ মাসের ফজিলত বরকত রহমত যে কোন মাস থেকেই বেশি। ইংরেজি মাস অনুযায়ী এবার পবিত্র মাহে রমযান এই এপ্রিল মাসেই শুরু হচ্ছে। আর তাই ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানদের জন্য ইংরেজি এই এপ্রিল মাস পবিত্র রমযান শুরু ও বাংলা নববর্ষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান পবিত্র রমযানের মাহাত্ম্য এবং গুরুত্ব সম্পর্কে কম-বেশি অবহিত। জন্মের পর থেকেই আমাদের দেশে একজন মুসলিম শিশু বাবা-মা-আত্মীয় পরিজনকে এই বিশেষ মাসে রোযা পালন, ইবাদত বন্দেগীতে ব্যস্ত থেকে মাসটাকে পালন করতে দেখে থাকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই মাসের গুরুত্ব সম্পর্কে জন্মের পর থেকে বেড়ে ওঠাকালীন বিভিন্নভাবে মানুষ অবহিত হয়ে থাকেন। এই মাসের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (সা)-এর হাদিসে এসেছে– এই পবিত্র মাসটি পেয়েও যে তাঁর জীবনের গুনাহ সমূহকে মাফ করিয়ে নিতে পারলো না তার মতো হতভাগা আর নেই। সুতরাং এ কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না, এই মহিমান্বিত বরকত ফজিলতপূর্ণ মাসটি আমাদের জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান পৃথিবীতে নানাবিধ কারণে একজন মানুষের পক্ষে পাপ অপরাধ থেকে মুক্ত থাকা অসম্ভব রকম কষ্টসাধ্য বিষয়। হয়তো মনের অজান্তেই আমরা নানারকম পাপ অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। আর এই পাপকে ক্ষমা করিয়ে সুষ্ঠু সুন্দর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের জন্যই মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য এরকম মহিমান্বিত বরকতময় মাসের ব্যবস্থা

রেখেছেন। সুতরাং এই মাসের সঠিক সদ্ব্যবহারে একজন মানুষ পরিপূর্ণ ঈমানদার মানুষে পরিণত হতে পারে। আমরা মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে মুনাজাত জানাই যেন আমরা এই পবিত্র মাসের মর্যাদা বরকত ও ফজিলত পরিপূর্ণভাবে হাসিল করতে পারি। আল্লাহ তাআলার দেয়া বিধি বিধান মোতাবেক সঠিক ও পরিপূর্ণভাবে ইহকাল ও পরকালীন ইবাদত বন্দেগী পালন করতে পারি।

বাংলা নববর্ষ

বাঙালি জাতির জীবনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মিলিত উৎসব বাংলা নববর্ষ। বাংলা নববর্ষ আমাদেরকে সাম্প্রদায়িকতা, কুপমুণ্ডুকতা, হিংসা, বিদ্বেষ এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শিক্ষা দেয়। যেটি আমাদের মহানবী (সা) ও ইসলামের মূল শিক্ষা। সকল মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ইসলামের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। নববর্ষ প্রতিটি জাতির জীবনে তাৎপর্যময়। পুরাতন বছরকে মূল্যায়ন করে আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে আহ্বান জানানো নববর্ষের অন্যতম লক্ষ্য। নতুন বছরের দিনগুলো জাতি, দেশ ও মানুষের জীবনে নতুন তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়। পুরাতন জরা জীর্ণকে পেছনে ফেলে নতুনকে আহ্বান জানানো নববর্ষের চিরায়ত বৈশিষ্ট্য। বাংলা নববর্ষের তাৎপর্য আমাদের গ্রামীণ জীবন থেকে শুরু করে শহুরে নাগরিক সমাজেও শাশ্বতভাবে উপস্থিত। আমাদের জাতীয় জীবনের মূল চালিকাশক্তি কৃষি। কৃষিকাজ, কৃষিভিত্তিক ফসলী সন হিসেবে বাংলা নববর্ষের উদ্ভব। আর তাই বাঙালি জীবনে চিরায়তভাবে বাংলা নববর্ষ বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। পুরাতনকে পেছনে ফেলে নতুনের আহ্বান একদিকে যেমন মানুষকে আত্ম উপলব্ধি করতে শেখায় অপরদিকে নতুনভাবে উজ্জীবিতও করে। বাংলা নববর্ষে পুরাতন ভুলগুলো যেন আমাদের জীবনে আর না ঘটে এবং নতুন বছর প্রত্যেকের জীবনে সমানভাবে সাফল্যমণ্ডিত হোক মহান আল্লাহর কাছে আমরা এই প্রার্থনা করি। নতুন বছর দেশ জাতি ও প্রত্যেক মানুষের জীবনে কাঙ্ক্ষিত সফলতা বয়ে আনুক।

করোনা মহামারীর এক কঠিন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে এ বছর আমাদের পবিত্র মাহে রমযান ও বাংলা নববর্ষ পালন করতে হচ্ছে। মহান রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে পবিত্র মাহে রমযান এর পরিপূর্ণ ফজিলত এবং বাংলা নববর্ষের প্রকৃত লক্ষ্য উদ্দেশ্য হাসিল করার তওফিক দান করুক। করোনাকালীন বিধি নিষেধ মেনে চলে প্রত্যেকের পবিত্র মাহে রমযান ও বাংলা নববর্ষ পালন করুন। প্রত্যেকের জীবনে মাহে রমযান ও বাংলা নববর্ষের উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করুক।♦

সূচি

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

পবিত্র মাহে রমযান

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান

রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ♦ ০৯

মুফতী মো. আব্দুল্লাহ

আহকামে রামাদান ♦ ১৩

বাংলা নববর্ষ

আখতার হামিদ খান

বাঙালি জীবনে পহেলা বৈশাখ ♦ ২৭

মুস্তাফা মাসুদ

বাংলা সন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ ♦ ৩৩

মুজিনগর দিবস

ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম

মুজিনগর থেকেই স্বাধীন সরকার ♦ ৩৯

র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী

বাংলাদেশের প্রথম সরকারের সুবর্ণজয়ন্তী ♦ ৪৪

মুজিববর্ষ

বিচারপতি শামসুদ্দীন চৌধুরী মানিক

ভূমিপুত্র শেখ মুজিব ♦ ৪৭

ইমাম মেহেদী

শতবর্ষে বঙ্গবন্ধুর যত অলংকার ♦ ৫৩

ব্যক্তিত্ব

হাফেয মাওলানা খন্দকার ফখরুদ্দীন হোসাইনী

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র) :

রেশমি রুমাল আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার ♦ ৫৭

ইতিহাস

মোজাম্মেল হোসেইন তোহা

ফাতিমা আল-ফিহরি :

বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে নারী ♦ ৬৭

মুহাম্মাদ আযান

ফারাও তুতেনখামেনের রহস্যাবৃত ট্রামপেট ♦ ৭৩

কবিতা

হাসান হাফিজ
করুণা-মাগুন♦৭৯
প্রত্যয় জসীম
বারোমাসে বারোরাশি♦৮০
আ শ ম বাবর আলী
এলো আজ বৈশাখ♦৮১
সমীর আহমেদ
জেগে ওঠো বাংলাদেশ♦৮২
আশরাফুল আযম খান
জ্যোতিময় পদ্মলোচন♦৮৩
আতাতুর্ক কামাল পাশা
হালখাতা♦৮৪
মঈনুল হক চৌধুরী
বোশেখ মানে স্বপ্ন দেখা♦৮৫
মারইয়াম মনিকা
অপেক্ষা♦৮৬

গল্প

শামস সাইদ
মুখ♦৮৭

সাহিত্য

মুহাম্মদ ইসমাঈল
ইসলাম ও মহানবী (সা) সম্পর্কে ফরাসী সাহিত্যিক
ভিক্টোর হুগো যা বললেন তার কথা ও কবিতায়♦৯৮
ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন
মেহজাবিন ইসলাম
পারভিন এতেসামি :
সমকালীন ইরানের প্রগতি ও মানবতার কবি♦১০৫
অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান
উনবিংশ শতকের প্রেক্ষাপট ও
মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য সাধনা♦১১৩

পরশমণি

আল-কুরআন

১। আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তার অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের হেদায়াত প্রাপ্ত হতে পার। *(আলে ইমরান : ১০৩)*

২। বলুন: হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং এতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। *(আল-মায়িদাহ : ৭৭)*

৩। আল্লাহর পথে যারা শহীদ হয়, তাদের তোমরা মৃত বল না বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। *(সূরা বাকারা : ১৫৪)*

৪। নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ তাআলার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করে থাকে। *(আনআম : ৫৯)*

আল-হাদীস

১। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে তৃপ্তিসহকারে খায় অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশে পড়ে থাকে অভুক্ত অবস্থায়। *(বায়হাকী শরীফ)*

২। সরকারে দো-আলম (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হব। *(বুখারী শরীফ)*

৩। মহানবী (সা) বলেছেন, আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়েছি। *(মুসনাদে আহমদ)*

৪। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক জিনিসেরই পরিচ্ছন্ন করার উপায় রয়েছে, আর অন্তর পরিষ্কার করার উপায় হল আল্লাহর যিকির। *(বায়হাকী শরীফ)*

৫। প্রিয় নবী (সা) বলেছেন, যার অন্তরে এক যাররা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না। *(মুসলিম শরীফ)*

৬। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ‘সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম সে যে তাঁর সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ করে। *(...........)*

পবিত্র মাহে রমযান

রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান

সাওম শব্দটি আরবি, যার ফারসি হলো রোযা। এই সাওম বা সিয়াম শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা, পরিত্যাগ করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশে যাবতীয় পানাহার এবং জৈবিক চাহিদা থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলা হয়। রোযা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। যা ঈমানের এক চতুর্থাংশ। এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'রোযা সবরের অর্ধেক।' অপর একটি হাদিসে এসেছে, 'রোযা ঈমানের অর্ধেক।' এমনকি হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালার উক্তি নবী

করিম (সা) বর্ণনা করেছেন, 'সকল সৎ কাজের সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত হবে, কিন্তু রোযা যেহেতু একান্তভাবে আমার জন্য, তাই আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো। রোযার বিষয়টি সরাসরি আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্কযুক্ত এ কারণে ইসলামের সকল রোকনের মধ্যে এটি সর্বোৎকৃষ্ট রোকন।

হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলগণ সিয়াম পালন করেছেন। যা কুরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এমনকি প্রাচীন মিশরীয়দের যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান, গ্রিক ও পারসিক ধর্মেও সাওমের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইসলাম পূর্ব এই সকল ধর্মে রোযার প্রচলন থাকলেও তা ইসলামি শরিয়তের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, তাদের রোযা পালনে অবাধ স্বাধীনতা রোযার প্রকৃত শিক্ষা, ভাবমূর্তি ও প্রাণশক্তিকে শেষ করে দিয়েছিল। ফলে যে রোযা মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যমে তার চারিত্রিক মহত্ত্ব, নৈতিক পরিচ্ছন্নতা, চিন্তার বিশুদ্ধতা ও আত্মিক পবিত্রতা এনে দেয় তা সময়ের পরিক্রমায় হয়ে পড়ল নিছক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

রোযাকে এই অবস্থা থেকে রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের উপর রোযাকে ফরজ করলেন। ফলে রোযা হলো মানুষের আত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক কল্যাণের অন্যতম ধারক ও বাহক।

রোযা ফরজ হওয়া সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হয়েছে যেমনি ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।' (সূরা বাকারা, ২ : ১৮৩)

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হচ্ছে, 'রোযার মাস এমন একটি মাস, যাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, যা মানবজাতির জন্য হেদায়েত, সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মাসটি পাবে, সে এতে রোযা রাখবে। যদি যে অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা সফরে থাকে, সে পরবর্তী সময় তা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, কখনোই কঠিন করতে চান না; যাতে তোমরা গণনা করে তা পূরণ করো। আল্লাহ তাআলা তোমাদের (কুরআনের মাধ্যমে) যে পথ দেখিয়েছেন তার জন্য তোমরা তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করো এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করো।' (সূরা বাকারা, ২ : ১৮৫)

রোযার ফজিলত সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখবে এবং তারাবির নামায আদায় করবে, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।' (বুখারি শরিফ)

মুসনাদে আহমাদে রাসূল (সা)-এর এক হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, 'রোযা বান্দার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে এবং বলবে, হে আমার রব! আমি দিনের বেলায় এ বান্দাকে পানাহার এবং স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছিলাম, তাই তার জন্য আমার সুপারিশ গ্রহণ করো। তখন বান্দার জন্য রোযার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।'

অন্য এক হাদিসে নবী করিম (সা) বলেন, 'তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে, রমযান মাসে রোযা রাখবে, নিজেদের সম্পদের জাকাত আদায় করবে, তাহলেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (আলমগীরী ১ম খণ্ড)

হযরত আবু উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত নবী করিম (সা) ইরশাদ করেন, 'রোযা হচ্ছে ঢালস্বরূপ, যদি না সে নিজেই তা বিদীর্ণ করে দেয়।' (বেহেশতি জেওর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১) অর্থাৎ ঢাল দিয়ে মুজাহিদগণ যেভাবে শত্রুর মোকাবিলা করে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন, গাজি হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে পারেন; তেমনি একজন রোযাদার রোযা পালনের মাধ্যমে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু শয়তানের মোকাবিলা করে নিজেকে গুনাহমুক্ত রাখতে সক্ষম হয়।

জান্নাতের একটি দরজার নাম 'বাবুর রাইয়ান'। এই দরজা দিয়ে রোযাদার ব্যতীত আর কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। অপরদিকে রোযাদারকে তার রোজার বিনিময়স্বরূপ আল্লাহর দিদারের ওয়াদাও দেয়া হয়েছে।

প্রত্যেক জিনিসেরই একটি দরজা থাকে। বলা হয়েছে ইবাদতের দরজা হলো রোযা। একজন রোযাদারের ঘুমও ইবাদত বলে গণ্য হয়। রাসূলের প্রিয় সাহাবি হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে মহানবী (সা) বলেন, 'যখন রমযান মাস শুরু হয়, তখন জান্নাতের দরজা খোলা হয়। আর জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করে, যারা কল্যাণ চাও তারা এগিয়ে এসো। আর যারা অনিষ্ট চাও তারা সরে যাও।'

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, 'কেউ জানে না তাদের আমলের (রোযার) প্রতিদানস্বরূপ তাদের জন্য কী গোপন রয়েছে, যা তাদের চোখ শীতল করবে।'

রোযা মূলত একটি অভ্যন্তরীণ আমল। এতে এমন কোনো আমল নেই যা চোখে দেখা যায়। অন্যান্য ইবাদতগুলো মানুষ দেখলেও রোযা আল্লাহ ব্যতীত

কেউই দেখতে পারে না। সেইসাথে রোযা আল্লাহ তায়ালার দুশমন তথা শয়তানের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। কামনা-বাসনা শয়তানের মূল চালিকাশক্তি। যা পানাহারের মাধ্যমেই প্রকট হয়ে উঠে। এজন্যই মহানবী (সা) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) কে বলেছিলেন, 'সবসময় জান্নাতের দরজায় কড়া নাড়ো। তখন তিনি আরজ করেছিলন, তা কীভাবে? তিনি বললেন, ক্ষুধার মাধ্যমে।' রোযাই শয়তানের জড় (মূল) উচ্ছেদ করে তার চলার পথ রুদ্ধ করে দেয়।

রোযা যেন কোনোক্রমেই অন্তঃসারশূন্য আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত না-হয়, এজন্য মহানবী (সা) ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে রোযা রাখতে বলেছেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখবে তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।' (কাযী খান, হাশিয়া আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

যে রোযাদারের ভিতরে আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া নেই, আছে লৌকিকতা, সে প্রকৃত অর্থে রোযার হক আদায় করতে পারলো না। রাসূলের প্রিয় সাহাবি হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করিম (সা) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও তদানুযায়ী আমল করা ছেড়ে দেয়নি তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।' (আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৯-১০)

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে মিথ্যা বলা ও গিবত করার দরুন রোযার বরকত বিনষ্ট হয়ে যায়। সেইসাথে যে কাজ রোযার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী তা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

রোযার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভের জন্য হালাল রুজি ভক্ষণ, হারাম জিনিস পরিহার, নিষিদ্ধ কথা ও কাজ থেকে অবশ্যই নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সংযত রাখতে হবে। বেশি বেশি মগ্ন হতে হবে আল্লাহর যিকিরে। মুক্ত করে দিতে হবে অসহায় ও সম্বলহীনদের প্রতি বদান্যতার হাত। তবেই রোযা যেমন আমাদের অন্তরে সজীবতা এনে দেবে তেমনি আমরা রোযার প্রকৃত স্বাদ অনুভব করতে পারবো।

তখনই এই রমযান মাস আমাদের কাছে পরিণত হবে রহমত, বরকত ও কল্যাণের মাস হিসেবে। ফলে এই সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আমাদের আত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হবে। প্রশস্ত হবে পরকালীন মুক্তির পথ।♦

আহকামে রামাদান

মুফতী মো. আব্দুল্লাহ

রোযা

পবিত্র মাহে রামাদান এর রোযা পালন করা ইসলাম ধর্মের তৃতীয় ফরয। কেউ যদি এ ফরয অস্বীকার বা অবিশ্বাস করে সে মুসলমান থাকে না। আর কেউ যদি তা পালন না করে তা হলে সে কঠোর পাপী বা 'ফাসিক' বলে গণ্য হয়।

রোযার নিয়ত

নিয়ত মানে মনের ইচ্ছা, মুখে কিছু বলুক বা না বলুক। মনের ইচ্ছার পাশাপাশি মুখেও তা বলে নেয়া ভালো; কিন্তু মুখে কিছু না বললেও নিয়ত হয়ে

যায়। রোযার বেলায় নিয়ত থাকা শর্ত। যদি মনে মনে রোযার নিয়ত না থাকে অথচ সারাদিন উপবাস থাকে, তাতে রোযা হবে না।

মাহে রামাদান এর রোযার নিয়ত রাতের মধ্যেই করে নেয়া উত্তম, যদি রাতে না করে থাকে সেক্ষেত্রে দিনের বেলায়ও যদি সূর্য ঢলে পড়ার দেড় ঘণ্টা পূর্বের যে-কোন সময় করে নেয়, তাতেও রোযা শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হল, কোন কিছু যেন পানাহার না করে।

যেসব কারণে রোযা নষ্ট হয়ে যায়

(১) কানে ও নাকে ঔষধ ঢেলে দেয়া (২) ইচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি করা (৩) কুল্লি করার সময় গলার ভেতরে পানি চলে যাওয়া (৪) কোনো নারীর সঙ্গে মাখামাখিতে বীর্যপাত হয়ে যাওয়া (৫) এমন কোন বস্তু গিলে ফেলা যা সাধারণত খাওয়া হয় না। যেমন কাঠ, লোহা, কাঁচা গম ইত্যাদি (৬) লোবান বা উদ কাষ্ঠ ইত্যাদির ধোঁয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নাক দিয়ে বা কণ্ঠনালীর ভেতরে টেনে নেয়া। বিড়ি, সিগারেট ও হোক্কা পান করারও একই বিধান (৭) ভুলে পানাহার করার পর এমনটি ধারণা করে যে, আমার রোযা নষ্ট হয়ে গেছে; পুন পানাহার করে নিল (৮) রাত বাকী আছে মনে করে সুবহে সাদেকের পর পানাহার করে নিল (৯) সূর্য ডুবে গেছে মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করে নিল। উল্লেখ্য, এসব ক্ষেত্রে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং শুধু রোযা কাযা করতে হয়, কাফফারা আবশ্যক হয় না (১০) ভুলে নয়, জেনে-বুঝে সুস্থ-সবল অবস্থায়, কোন ওযর-সমস্যা ব্যতীত দিনের বেলায় পানাহার করলে অথবা স্ত্রী-সঙ্গম করলে, সেই রোযার কাযাও করতে হয় এবং কাফফারাও প্রদান করতে হয়। ‘কাফফারা’ হল, একটি ক্রীতদাস মুক্তকরণ; অথবা একাধারে ৬০টি রোযা পালন করা। আর যদি রোযা রাখার শক্তি-সামর্থ্য না থাকে, সেক্ষেত্রে ৬০জন মিসকীনকে দু’বেলা পেটপুরে খাবার খাওয়াতে হবে। এ যুগে যেহেতু শরীয়তসম্মত গোলাম বা ক্রীতদাস বাস্তবে নেই, সে কারণে কাফফারা’র ক্ষেত্রে শেষোক্ত দু’টির যে-কোন একটি পালন করতে হবে।

যেসব কারণে রোযা মাকরূহ হয়

(১) রোযা অবস্থায় দিনের বেলায় অপ্রয়োজনে কোন বস্তু চিবানো অথবা লবণ ইত্যাদি জিহবায় দিয়ে থু থু ফেলে দেয়া; টুথপেস্ট বা মাজন বা কয়লা দ্বারা দাঁত মাজা বা পরিষ্কার করা (২) সারাদিন গোসল ফরয অবস্থায় অপবিত্র কাটিয়ে দেয়া (৩) একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সিংগা লাগানো এবং দুর্বল হয়ে পড়ার ভয় থাকলে নিজ শরীর থেকে অন্যের জন্য রক্তদান করা মাকরূহ; কিন্তু তাতে রোযা নষ্ট হয় না (৪) রোযা অবস্থায় গীবত করা তথা কারও অবর্তমানে তার দোষ বর্ণনা করা রোযার ক্ষেত্রে মাকরূহ বটে; কিন্তু এ গীবত কর্মটি অন্যতম একটি হারাম কাজ ও কবীরা

গুনাহ বটে। মাহে রামাদানে এর পাপ আরও অনেক গুণ বেড়ে যায় (৫) রোযা অবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ, গালি-গালাজ করা; হোক তা কোন মানুষের সঙ্গে বা কোন জীবজন্তুকে বা কোন প্রাণহীন জড় বস্তুকে; এসব কারণেও রোযা মাকরূহ হয়ে যায়।

যেসব কারণে রোযা নষ্টও হয় না মাকরূহও হয় না

(১) মিসওয়া করা (২) মাথায় বা মোচ-দাড়িতে তেল ব্যবহার করা (৩) চোখে ঔষধ বা সুরমা দেয়া (৪) আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করা (৫) গরম ও পিপাসার কারণে গোসল করা (৬) যে-কোন রকম ইনজেকশন বা টিকা দেয়া (৭) ভুলবশত পানাহার করা (৮) অনিচ্ছাবশত গলায় ধোঁয়া বা ধুলোবালি বা মাছি ইত্যাদি প্রবেশ করা (৯) কানে পানি দেয়া (২/১ ফোটা) অথবা অনিচ্ছাকৃত প্রবেশ করা (১০) অনিচ্ছাকৃত বমি হওয়া (১১) শোয়া অবস্থায় স্বপ্নদোষ হয়ে যাওয়া (১২) দাঁত হতে রক্ত বের হওয়া এবং তা গলা অতিক্রম না করা (১৩) ঘুমের মধ্যে বা সহবাসের কারণে রাতে গোসল ফরয হয়েছিল; অথচ সুবহে সাদেকের পূর্বে গোসল করা হয়নি; আর এমতাবস্থায় রোযার নিয়ত করে নেয়া হয়েছে; তাতেও রোযার কোন ক্ষতি নেই।

যেসব কারণে রামাদানে রোযা না রাখার অনুমতি আছে

(১) রোগের কারণে রোযা পালনের শক্তি না থাকলে, অথবা রোগ বেড়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা হলে রোযা না রাখা জায়েয; তবে পরবর্তিতে কাযা করা জরুরী হবে (২) যে নারী গর্ভধারণ অবস্থায় আছে এবং রোযা রাখতে গেলে গর্ভস্থিত শিশুর বা নিজের প্রাণের ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা থাকে; সেক্ষেত্রে রোযা না রেখে পরবর্তিতে কাযা করে নিতে পারবে (৩) যে নারী নিজের বা অন্য কারও শিশুকে দুধ পান করায় ; এমতাবস্থায় যদি রোযার কারণে শিশু দুধ না পায়, কষ্ট হয়; তা হলে সেক্ষেত্রে রোযা না রেখে পরে কাযা করে নিবে (৪) শরীয়তসম্মত মুসাফির যিনি ন্যূনতম ৮৭ (সাতাশি কিলোমিটার, সাতশত বিরাশি মিটার ও চল্লিশ সেন্টিমিটার সমপরিমাণ : সূত্রঃ জাদীদ ফিকহি মাসায়েল : খ-১, পৃ-১৪২) কিলোমিটার দূরত্ব সফরের নিয়তে বের হবেন তাঁর জন্যও রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। তারপরও, সফর যদি কষ্টের না হয় তা হলে সেক্ষেত্রে রোযা রাখাই তাঁর জন্য উত্তম। কিন্তু যেক্ষেত্রে নিজের বা সফরসঙ্গীদের কষ্ট হতে পারে, সেক্ষেত্রে রোযা না রাখাই উত্তম। (৫) রোযা রেখে সফর শুরু করলে, সেক্ষেত্রে রোযাটি পূর্ণ করাই জরুরী। সফররত অবস্থায় পানাহার করে দিনের বেলায় বাড়িতে বা নিজ ঠিকানায় পৌঁছলে, দিনের অবশিষ্ট সময় পানাহার না করাই সমীচীন। যদি এমন হয় যে, এখনও কোন কিছু পানাহার করা হয়নি; আর এমতাবস্থায় বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে যে, তখনও রোযার নিয়তের সময় বাকী থাকে; সেক্ষেত্রে

তাঁর জন্য রোযার নিয়ত করে নেয়া জরুরী (৬) কাউকে যদি হত্যা করার হুমকি দিয়ে রোযা ভাঙ্গতে বাধ্য করা হয়; তার পক্ষে রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয তবে পরে তা কাযা করে নেবে (৭) কোন রোগের কারণে বা ক্ষুৎ-পিপাসার প্রাধান্য যদি এমন পর্যায়ের হয় যে, একজন বিজ্ঞ ও ধার্মিক মুসলমান চিকিৎসকের মতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রাণের আশঙ্কা দেখা দেয়; সেক্ষেত্রে রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয এমনকি জরুরীও বটে। অবশ্য পরে তা কাযা করে নেবে (৮) নারীদের জন্য মাসিক ঋতুস্রাব চলাকালীন এবং সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর প্রসূতি অবস্থায় রোযা রাখা জায়েয নয়; পরবর্তিতে তা কাযা করে নিতে হবে। রোগী, মুসাফির, হায়েয ও নেফাসগ্রস্ত নারী, যাদের জন্য রামাদানে রোযা না রাখা ও পানাহার করা জায়েয; তাদের পক্ষেও মাহে রামাদানের সম্মান বজায় রাখা আবশ্যক। যে কারণে তাঁরাও প্রকাশ্যে সবার সামনে পানাহার করতে যাবেন না।

রোযার কাযা

(১) কোন ওযরবশত রোযা কাযা হয়ে গেলে, যখন ওযর দফা হয়ে যায় তখন আর বিলম্ব না করে ওই রোযা কাযা করে নেয়া চাই। জীবনের যেমন কোন ভরসা নেই, তেমনি শক্তি-সামর্থ্য ও সুস্থতারও কোন বিশ্বাস নেই। কাযা রোযার ক্ষেত্রে যেমন একাধারে তা পালনের এখতিয়ার থাকে, তেমনি ২/১টি করে পৃথক পৃথকও রাখার এখতিয়ার আছে (২) মুসাফির সফর থেকে ফিরে আসার পর অথবা অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পর যদি এটুকু সময় না পায়, যাতে কাযা রোযাগুলো আদায় করতে পারে; সেক্ষেত্রে ওই রোযার কাযা তার ওপর আবশ্যক হয় না। অর্থাৎ ফিদিয়া আদায় জরুরী হয় না। তবে সফর থেকে ফিরে আসার পর অথবা সুস্থ হওয়ার পর যে কয়দিন সুযোগ পেয়েছিলেন অথচ কাযা আদায় করেননি, সে কয়দিনের কাযা তাঁর ওপর আবশ্যক হিসাবে বর্তাবে এবং ইতোমধ্যে মারা গেলে ওই কয়দিনের ফিদিয়াও তাঁর ওপর আবশ্যক হবে।

সাহরী

রোযা পালনকারীর জন্য শেষরাতে সুবহে সাদেকের পূর্বে সাহরী খাওয়া একটি সুন্নাত আমল, সওয়াব প্রাপ্তির উপায় ও বরকতপূর্ণ কাজ। অর্ধ-রাতের পরে যখনই কিছু খেয়ে নিবে, সাহরির সুন্নাত পালিত হয়ে যাবে। তবে একেবারে শেষরাতের দিকে সাহরী খাওয়া অধিক উত্তম। মুয়াযযিন যদি ভুলবশত সাহরির শেষ সময়ের পূর্বে আযান দিয়ে বসেন, তাতে সাহরী খাওয়া নিষেধ হয়ে যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত সুবহে সাদেক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সাহরী খেয়ে মনে মনে রোযার নিয়ত করে নিলেই, রোযা সহীহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। আর তার পাশাপাশি মুখেও যদি এমন কোন বাক্য উচ্চারণ করে যাতে রোযার নিয়ত বোঝা যায়; তা-ও

ভালো। যেমন– (উচ্চারণ– বিসাওমি গাদিন্ নাওয়াইতু মিন্ শাহ্রি রামাদন) অর্থাৎ ‘আমি আগামী দিনের রোযার নিয়ত করলাম’।

ইফতারী

সূর্য ডুবে গেছে মর্মে নিশ্চিতভাবে জানার পরও ইফতার করতে বিলম্ব করা মাকরূহ। তবে হ্যাঁ, মেঘ-বৃষ্টি ইত্যাদির দরুন যদি সংশয় জাগে, সেক্ষেত্রে ২/৪ মিনিট বিলম্ব করাই উত্তম। তা ছাড়া, সাহরী, ইফতার ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিন মিনিটের সতর্কতামূলক পদক্ষেপ সর্বক্ষেত্রেই থাকা চাই (মুফতী মুহাম্মদ শফী‘ র.: জাওয়াহিরুল ফিকহ্, ১ম খন্ড, পৃ-৩৮১)।

খেজুর ও খোরমা দ্বারা ইফতার করা উত্তম। অন্য কিছু দ্বারা ইফতার করলে তাতেও কোন ক্ষতি বা মাকরূহ হওয়ার কিছু নেই। ইফতারকালীন এই দু‘আ পাঠ করা সুন্নাত– (উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া ‘আলা রিযক্বিকা আফতারতু) অর্থাৎ ‘হে আল্লাহ্ আপনারই জন্যে রোযা পালন করেছি এবং আপনারই প্রদত্ত রিযিক দ্বারা ইফতার করছি’; এবং ইফতার শেষে এই দু‘আ পড়া ভালো– (উচ্চারণ- যাহাবায্-যামা-উ ওয়াবতাল্লাতিল উরূক্বু ওয়া-ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ্)। অর্থাৎ ‘বিদূরিত হল পিপাসা, রগ-রেশা সব সজীব-সতেজ হল এবং ইনশাআল্লাহ্ আজর-সওয়াব নিশ্চিত হল’।

তা ছাড়া, ইফতার পূর্ববর্তী সময়ে যখন একাকী বা যৌথ দু‘আ, দুরূদ ও ইস্তেগফার ইত্যাদি পাঠ করা হয় তখন এই দু’টি দু‘আও বেশি বেশি পাঠ করা যেতে পারে– (উচ্চারণ– ইয়া ওয়াছিয়াল-ফাদলি ইগফির লী) অর্থাৎ ‘হে বিশাল অনুগ্রহ-দয়া’র মালিক! আমায় ক্ষমা করে দিন!’ অথবা এটিও পাঠ করা যেতে পারে– (উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা মাগফিরাতুকা আওছাউ‘ মিন্ যাম্বী ওয়া-রাহ্মাতুকা আরজা ইন্দী মিন্ ‘আমালী) ‘অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার পাপের পরিধির চেয়ে আপনার ক্ষমার পরিধি অনেক বেশি প্রশস্ত-সীমাহীন এবং আমার আমলের চেয়ে আমি আপনার রহমতের অনেক বেশি প্রত্যাশী’।

তারাবীহ

(১) মাহে রামাদানে এশা’র সালাতের ফরয ও দু’রাকাত সুন্নাতের পর বিশ (২০) রাকাত তারাবীহ নামায আদায় করা ‘সুন্নাতে মুয়াক্কাদা’ (২) জামা‘আতের সঙ্গে তারাবীহ নামায আদায় করা ‘সুন্নাতে কিফায়া’। পাড়া- মহল্লার মসজিদে যদি জামাতের সঙ্গে তারাবীর জামাত হয় আর কোন ব্যক্তি নিজগৃহে একাকী তারাবীহ পড়ে নেয়, তাতেও তার তারাবীর সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে; তবে সে জামাতে পড়ার সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু যদি মহল্লায় জামাত না হয় তা হলে সকলেই সুন্নাত পরিহারের পাপে পাপী বলে গণ্য হবেন (৩) তারাবীর মধ্যে পুরো

ত্রিশ পারা কুরআন পাঠ করাও আরেকটি পৃথক সুন্নাত। কোন পাড়া-মহল্লায় যদি হাফেয পাওয়া না যায়; অথবা পাওয়া গেলেও সেই হাফেয শর্ত-সাপেক্ষে ও সুনির্দিষ্ট পারিশ্রমিক ব্যতীত তারাবীহ পড়াতে সম্মত না হলে, সেক্ষেত্রে ছোট ছোট সূরা দ্বারাই তারাবীহ নামায আদায় করে নিতে হবে। খতমে তারাবীহ প্রশ্নে পারিশ্রমিক বা হাদিয়া ইত্যাদি বিতর্কের বাড়াবাড়িমুক্ত সমাধানকেন্দ্রিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফতির পৃথক গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে। প্রয়োজনে সেটি দেখা যেতে পারে (৪) কোন হাফেয যদি এক মসজিদে বিশ রাকাত তারাবীহ পড়িয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে একই রাতে অন্য মসজিদে আবার তারাবীহ পড়ানো জায়েয নেই (৫) কারও যদি ২/৪ রাকাত তারাবীহ ছুটে যায়, সেক্ষেত্রে ইমাম যখন বিতির এর জামাত পড়ান তখন ওই ব্যক্তিরও ইমামের সঙ্গে বিতির পড়া চাই। নিজের বকেয়া ওই কয় রাকাত পরে পড়ে নিতে পারবেন (৬) পবিত্র কুরআনকে এত দ্রুত পাঠ করা, যে কারণে কোন শব্দ বা হরফ বাদ পড়ে যায় –তা পাপের মধ্যে গণ্য। সেক্ষেত্রে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েই সওয়াব হতে বঞ্চিত হবেন (৭) জমহুর আলেমগণের গবেষণামূলক চূড়ান্ত ফাতওয়া হল, নাবালককে তারাবীর জামাতের ইমাম বানানো জায়েয নয় (শামী ইত্যাদি দ্র.)।

ই'তিকাফ

(১) ই'তিকাফ মানে অবস্থান করা। ইবাদতের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করাকেই 'ই'তিকাফ' বলা হয়। ই'তিকাফরত অবস্থায় এমন সব প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ থেকে বাইরে বের হওয়া জায়েয নয়, যা মসজিদে সম্পাদন করা যায় না। যেমন মল-মূত্র ত্যাগ করার প্রয়োজন বা ওয়াজিব গোসলের প্রয়োজন বা উযূ ইত্যাদির প্রয়োজনে। অর্থাৎ কেবল এসব প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বাইরে বের হওয়া যাবে এবং প্রয়োজন শেষ করে তাৎক্ষণিক মসজিদে প্রবেশ করবে (২) মাহে রামাদানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিফায়া'। অর্থাৎ শহরের পাড়া-মহল্লার বা গ্রামের কোন একজনও যদি ই'তিকাফ না করে তা হলে সকলেই সুন্নাত পরিহারের পাপে গুনাহগার হবে। আর যদি কোন একজনে ই'তিকাফ করে নেয় তা হলে সকলের পক্ষ থেকেই সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে (৩) ই'তিকাফ অবস্থায় একেবারে চুপচাপ থাকা জরুরী নয় বরং তেমনটি মাকরূহ। অবশ্য বিভিন্ন নেক আমলের পাশাপাশি অবসর সময়ে ভালো কথা, সওয়াবের আলোচনা করা, নবী-রাসূল ও ওলী-আউলিয়াদের জীবনী বিষয়ে পরস্পর আলোচনা এবং তা'লীমের মাধ্যমে সময় পার করা উচিত। তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ ও অনর্থক বাক্যালাপ থেকে বেঁচে থাকা চাই (৪) ই'তিকাফ অবস্থায় বিশেষ কোন ইবাদত করা শর্ত নয়; নামায, তিলাওয়াত বা ধর্মীয় বই-পুস্তক পাঠ, পড়ানো অথবা মনের চাহিদা

মোতাবেক যে কোন ইবাদতই করা যেতে পারে (৫) যে মসজিদে ই'তিকাফ করা হচ্ছে, তাতে যদি জুমু'আর সালাত না হয়, তা হলে পার্শ্ববর্তী জামে মসজিদে জুমু'আর উদ্দেশ্যে এমনভাবে অনুমান করে বের হবে যেন সেখানে গিয়ে সুন্নাত পড়া শেষ করে খোৎবা শোনা যায়। অবশ্য সেই জামে মসজিদে যদি কিছুটা বেশী সময় কেটে যায়, তাতেও ই'তিকাফের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু পথিমধ্যে বা মসজিদের বাইরে যদি অনুমেদিত প্রয়োজন ছাড়া সামান্য সময়ও বিলম্ব করে তা হলে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে (৬) স্বভাবজাত প্রয়োজন ও শরীয়তসম্মত কোন প্রয়োজন ব্যতীত যদি সামান্য সময়ের জন্যও মসজিদ থেকে বাইরে চলে যায় অথবা প্রয়োজনে গিয়ে অপ্রয়োজনে বাইরে অবস্থান করে; তা হলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে; হোক তা ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃত। তেমনটি করলে ওই ই'তিকাফ পরবর্তিতে কাযা করতে হবে (৭) মাহে রামাদান এর শেষ দশকের ই'তিকাফ করতে চাইলে, সেক্ষেত্রে বিশ রামাদান দিনের শেষে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বেই মসজিদে ঢুকে পড়বে এবং যখন ঈদের চাঁদ দেখে নিবে বা বিধি মোতাবেক চাঁদ দেখার সংবাদ শুনবে, তখন ই'তিকাফ থেকে বের হয়ে যাবে (৮) মূল বিধান মতে, জুমু'আর গোসলের জন্য অথবা কেবল শীতলতা অর্জনের জন্য গোসল করলেও ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যায়; তবে ব্যতিক্রম হিসাবে যদি গোসল না করলে, স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায় বা অস্বস্তি লাগে সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মতে, হয়তো মহান আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন। সুতরাং যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করা চাই।

শবে কদর

এ উম্মতের প্রাপ্ত গড় বয়স যেহেতু অন্যান্য উম্মতের লোকজনের তুলনায় স্বল্প হয়ে থাকে, সে কারণে মহান আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে একটি রাত এমন নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যাতে ইবাদত করা একহাজার মাসের চেয়েও অধিক সময়কাল ব্যাপী ইবাদতের নামান্তর হয়ে যায়। কিন্তু সেটিকে গোপন রেখেছেন যেন মানুষ তা অনুসন্ধানে লিপ্ত হয় এবং এই সুযোগে অসীম সওয়াবের ভাগীদার হয়ে যায়। এই লায়লাতুল-কদর রাতটি মাহে রামাদানের শেষ দশকের বেজোড় রাতেই হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক। অর্থাৎ ২১তম, ২৩তম, ২৫তম, ২৭তম ও ২৯তম রাত্রিতে এবং বিশেষ করে ২৭তম রাতেই তা হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। এ সব রাতে অনেক পরিশ্রম করে ইবাদত, তাওবা ও ক্ষমা প্রর্থনা এবং দু'আ-মুনাজাতে কাটানো উচিত হবে। একান্ত পুরো রাত যদি সজাগ থাকা শক্তিতে না কুলায় বা অবসর পাওয়া না যায়, সেক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব হয় জাগতে সচেষ্ট হবে এবং নফল নামায বা কুরআন

তিলাওয়াত বা যিকির, তাসবীহ ও দুরূদ পাঠে ব্যস্ত থাকবে। একেবারে কিছুই করতে না পারলে, সেক্ষেত্রেও অবশ্যই এশা'র নামায ও ফজরের নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করা চাই। হাদীস শরীফে এসেছে, এতেও রাত জাগরণের সওয়াব দেয়া হয়। এসব রাতে কেবল অনুষ্ঠান ও ওয়ায-নসীহতে সময় কাটিয়ে ঘুমিয়ে পড়া অনেক বড় বঞ্চনার নামান্তর। ওয়ায-বক্তব্য তো অন্য সব রাতেও হতে পারে; কিন্তু ইবাদতের এই সুযোগ-সময় তো আর পাওয়া যাবে না।

অবশ্য যারা সারা রাত জাগার সাহস, শক্তি ও ইচ্ছা রাখেন তারা যদি শুরুতে কিছু ওয়াযও শুনে নেন, তার পর নফল ইবাদত ও দু'আ-দুরূদে আত্মনিয়োগ করেন, তাতেও কোন সমস্যা নেই।

বরকতময় শবে-কদরের রাতে অধিক হারে এ দু'আটি পাঠ করার কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যথা- (উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুউন্ তুহিব্বুল-'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী) অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! নিশ্চিত আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন!'।

রোযা ও চিকিৎসা বিষয়ক কয়েকটি আধুনিক জরুরী বিধান ও প্রসঙ্গ

শরীয়তের ব্যবহারিক বিধি-বিধান মূলত কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দলিল–প্রমাণনির্ভর প্রামাণ্য হতে হয়; কেবল যুক্তিনির্ভর হলেই চলে না। আবার এই কুরআন-সুন্নাহ্‌রই ভাষ্য থেকে আরও দু'টি বিষয় অর্থাৎ 'ইজমা' ও 'কিয়াস' বিধি-বিধানের উৎস হিসাবে পাওয়া যায়। আর এই শেষোক্ত 'কিয়াস' বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় 'ইজতিহাদ' তথা গবেষণা-অনুসন্ধান কর্মের; যার অনিবার্য অন্যতম অনুসঙ্গ হচ্ছে পারস্পরিক তুলনা ও যৌক্তিক বিবেচনা। সুতরাং এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, শরীয়তের বিধান খুঁজে বের করার ভিত্তি যে উৎস চতুষ্টয়ের ওপর তাতে 'যুক্তি' এর ক্রম অনুপস্থিত; তবে চতুর্থ নম্বরে যে উৎসটি রয়েছে সেই 'কিয়াস' বা 'ইজতিহাদ' এর ক্ষেত্রে যুক্তি বিষয়টি কাজে লাগে তথা সহায়ক হয়ে থাকে অবশ্যই; কিন্তু এই যুক্তির ওপর ভিত্তি করেই কেবল শরীয়তের বিধান নির্ণিত বা চিহ্নিত বা স্থিরীকৃত হয় না।

সুতরাং রোযা অবস্থায় অ্যাজমা বা হাঁপানী রোগের প্রকোপ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে 'ইনহেলার ব্যবহারের বৈধতা'র প্রশ্নে কোনো কোনো দৈনিক পত্রিকার মাসায়েল আলোচনায় কেবল এমন যুক্তি যে, 'এতে খাদ্যের অভাব পূরণ হয় না; পানির অভাব পূরণ হয় না। এটি পাকস্থলীতে যায় না; ফুসফুস পর্যন্ত পৌঁছে। এটি গ্যাস বা বাতাস মাত্র' যথেষ্ট নয়। তার কারণ, এমন যুক্তিতে বা এটুকু যুক্তিতে যদি এক্ষেত্রে রোযা না ভাঙ্গে তা হলে ধূমপানে এবং অনুরূপ আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রেও রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা তা দ্বারাও খাদ্যের অভাব পূরণ হয় না; তা বেশি

পৌঁছলে, ফুসফুস পর্যন্তই পৌঁছে এবং তা-ও গ্যাস বা বাতাস মাত্র। অথচ মুফতিদের কাছে প্রামাণ্য হিসাবে ধর্তব্য এমন অনেক গ্রন্থেই যুগ যুগ ধরে লিখিত হয়ে আসছে যে, 'ইনহেলার ব্যবহারে (অক্সিজেন-বাতাসের কারণে নয়, তার মধ্যে ঔষধ/গ্যাস থাকার কারণে এবং ইচ্ছার সংযোগ থাকার কারণে) রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তা সুবিধা মত সময়ে কাযা করতে হবে' (জাদীদ ফিকহি মাসাইল, আহসানুল ফাতাওয়া, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ইমদাদুল ফাতাওয়া, ফাতাওয়া ও মাসাইল-ইফা ইত্যাদি দেখা যেতে পারে)।

রোযা ভাঙ্গার প্রশ্নে সাধারণ ও ব্যাপক হারে আকরগ্রন্থগুলোতে ('আ-ম্মা', 'জায়েফা' ও মূল 'মানফায') মস্তিষ্কে ও পাকস্থলিতে স্বাভাবিক পথে ও সরাসরি মুখের মাধ্যমে পৌঁছার কথা যেমন বলা হয়েছে; ঠিক তেমনি অস্বাভাবিক পথে যেমন কান, নাকের মাধ্যমেও যদি কোন ঔষধ, তেল ইত্যাদি মস্তিষ্কে পৌঁছে বা গলা অতিক্রম করে বা পাকস্থলিতে পৌঁছে– তাতেও রোযা ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং এমন যুক্তি বা সীমীতকরণ যে, 'পানাহারের কাজ না দিলে, তাতে রোযা ভাঙ্গবে না'; কিংবা 'ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করলে'; কিংবা 'পানাহারের স্বাভাবিক পথে (মুখে) না হলে রোযা ভাঙ্গবে না'– এমন কোনো 'শেষকথা' বা 'যুক্তি' বাস্তবে বা সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়। বরং সঠিক হল, সেসব নীতি, মূলনীতি ও সুনির্দিষ্ট সমাধান যা সার্বিক বিবেচনান্তে গৃহীত হয়ে হাজার বছর ধরে বর্ণিত ও পালিত হয়ে আসছে এবং তাতে 'ইজমা'-ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। যেমন:

(১) 'অ্যাজমা ও হাঁপানী রোগীদের অক্সিজেন বা ইনহেলার ব্যবহারের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যা ......তার সঙ্গে যদি ওষুধের সংমিশ্রণ থাকে, তা হলে সেক্ষেত্রে আবার তাতে রোযা ভেঙ্গে যাবে' (জাদীদ ফিকহি মাসাইল: ১/১৮৮)।

(২) 'ইউনানী ও আয়ূর্বেদিক বিভিন্ন ওষুধ মুখ দিয়েও খেতে হয় না; কেবল জাল দেয়া বা গরমকৃত ভাঁপ বা বাষ্প নাক দ্বারা নিতে হয়; যা তাৎক্ষণিক নাক দিয়ে গলা অতিক্রম করে বক্ষদেশ (ফুসফুস) পর্যন্ত পৌঁছে থাকে; তাতেও রোযা ভেঙ্গে যাবে' (জাদীদ ফিকহি মাসাইল: ১/১৮৮)। অথচ উক্ত আলোচিত লেখকের যুক্তি মতে তো এক্ষেত্রেও রোযা না ভাঙ্গার কথা (?) যেহেতু পানাহারের কাজও দিচ্ছে না; আবার পাকস্থলিতেও যাচ্ছে না?

(৩) 'নারীর লজ্জাস্থানে কোনো কিছু (ওষুধ ইত্যাদি) রাখলে বা ব্যবহার করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে' (প্রাগুক্ত: পৃ-১৮১)। এক্ষেত্রেও তো উক্ত লেখকের যুক্তি মতে, রোযা ভঙ্গ হওয়ার কথা নয় (?) কারণ, এতেও পানাহারের কল্যাণ বা পাকস্থলিতে সরাসরি দেয়া হচ্ছে না?

(৪) ‘নাক, কান ও মলদ্বারের পথে পাকস্থলীতে বা মস্তিষ্কে পৌছতে পারে– এমন ওষুধ এ সব স্থানে ব্যবহারেও রোযা ভেঙ্গে যায়’ (প্রাগুক্ত)। অথচ উক্ত লেখকের বক্তব্য মতে, যেহেতু সরাসরি পাকস্থলিতে দেয়া বা নেয়া হচ্ছে না, তাই রোযা ভাঙ্গার কথা নয়?

(৫) “পায়খানা বন্ধ হওয়া অবস্থায় ‘অনিমা’ (বা ‘সাপোজিটর’) নেয়া হয় সেক্ষেত্রে ওষুধস্বরূপ তা আভ্যন্তর ভাগে লাগানো হয়। এতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তার ওপর কাযা করা ওয়াজিব হবে” (মাসায়েলে রোযা : রফয়ত কাসেমী, পৃ-১৩২, দেওবন্দ)। অথচ উক্ত লেখকের বক্তব্য মতে, এক্ষেত্রেও রোযা ভঙ্গ হবে না? কেননা তা তো পাকস্থলিতে নেয়া হয়নি?

(৬) হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যা কেবল ঘ্রাণ নিলেই মুখ দ্বারা সেবনের অনুরূপ ফলদায়ক, উপকারী হয়। ইনজেকশন দ্বারা রোযা ভাঙ্গে না; কিন্তু তার মাধ্যমে যদি পাকস্থলিতে ওষুধ পোঁছানো হয় তা হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে (ফাতাওয়া মাহমুদিয়াঃ খ-১৭, পৃ-১৬৬-১৬৭)। অথচ উক্ত লেখকের বক্তব্য মতে, রোযা ভঙ্গ হবে না? কেননা, তা তো পাকস্থলিতে নেয়া হয়নি (?)

(৭) ডুশ ব্যবহার বা হাঁপানীর প্রকোপ নিরসনে গ্যাস জাতীয় ওষুধ ব্যবহারের দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যাবে (ফাতাওয়া ও মাসাইলঃ খ-৪, পৃ-৪১,ইফা)। অথচ উক্ত লেখকের বক্তব্য মতে, ডুশ-গ্যাস এ সবে রোযা ভাঙ্গে না!

(৮) নাকে ওষুধ দিলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কেননা নাকের দিক থেকে গলা’র দিকে স্বাভাবিক পথ বিদ্যমান (খানিয়া + হিন্দিয়াঃ ১/২১০)। অথচ উক্ত লেখকের মতে, তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না। তার কারণ, তা তো পাকস্থলিতে নেয়া হয়নি এবং পানাহারের কাজও তা দ্বারা পূর্ণ হয়নি!

কোন্ কোন্ চিকিৎসায় বা ঔষধ সেবনে রোযা ভাঙ্গবে না

‘শুধু অক্সিজেন গ্রহণের কারণে রোযা নষ্ট হবে না; কারণ তা সাধারণ বাতাস গ্রহণেরই নামান্তর। কিন্তু তার সঙ্গে ঔষুধ থাকলে রোযা নষ্ট হবে’ (জাদীদ ফিকহি মাসাইলঃ ১/১৮৮+ ইমদাদুল মুফতীনঃ পৃ-৪৮৮-৪৯২; দারুল ইশা‘আত, করাচী)।

‘ঔষুধ ব্যবহারের মাধ্যমে মহিলাদের মাসিক স্রাব বন্ধ রেখে ত্রিশ রোযা পূর্ণ করে নেয়া বৈধ। এতে কোন পাপ হবে না। তবে মাসিকের সাধারণ গতি বন্ধ রাখায় স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হলে, সেটা ভিন্ন ব্যাপার; যা বিজ্ঞ চিকিৎসকগণই ভালো বলতে পারেন’ (জাদীদ ফিকহি মাসাইলঃ ১/১৮৮)।

‘রোযা রেখে শরীর থেকে রক্ত দিলে বা শরীরে রক্ত নিলে রোযার কোনো ক্ষতি হয় না। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, বিধি মোতাবেক যেসব পথে (মানফায)

কোনো কিছু প্রবেশ করালে রোযা ভেঙ্গে যায়; সেসব পথে রক্ত প্রবেশ বা বের করা হয় না' (ইমদাদুল মুফতীন: পৃ-৪৮৮-৪৯২; দারুল ইশা'আত, করাচী/জাদীদ ফিকহি মাসাইল: ১/১৮৮)।

'একইভাবে চিকিৎসাস্বরূপ স্যালাইন গ্রহণেও রোযা নষ্ট হয় না। কারণ, তা সেই সুনির্দিষ্ট পথ বা ছিদ্রের বাইরে রগের মাধ্যমে বা গোশতে গ্রহণ করা হয়' (জাদীদ ফিকহি মাসাইল: ১/১৮৮ ইমদাদুল মুফতীন: পৃ-৪৮৮-৪৯২; দারুল ইশা'আত, করাচী)।

'রোযা অবস্থায় ডায়াবেটিস রোগির ইনসুলিন ব্যবহারেও রোযা নষ্ট হয় না'। কারণ, তা-ও সেই ইনজেকশনের মাধ্যমে রক্ত গ্রহণের অনুরূপ। তবে এই ইনসুলিনই যদি মুখে সেবনযোগ্য ঔষুধ/টেবলেট আকারে (তেমনটি আবিষ্কৃত হলে) মুখ দ্বারা গ্রহণ করা হয়; সেক্ষেত্রে আবার রোযা ভেঙ্গে যাবে (জাদীদ ফিকহি মাসাইল: ১/১৮৮; ইমদাদুল মুফতীন: পৃ-৪৮৮-৪৯২; দারুল ইশা'আত, করাচী)।

'রোযা অবস্থায় চোখে ঔষুধ বা ড্রপ সুরমা বা মলম ব্যবহারে রোযা নষ্ট হয় না; যদিও এসবের স্বাদ গলায় অনুভূত হয়। মাথায় তৈল ব্যবহারে এবং আতর-সুগন্ধি ব্যবহারে রোযা নষ্ট হবে না। কারণ, এসব ক্ষেত্রে রোযা না ভাঙ্গার বিষয়টি সরাসরি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত' (মারাকিউল-ফালাহ: পৃ-৩৬১/জাদীদ ফিকহি মাসাইল: ১/১৮৮)।

'রোযা অবস্থায় দিনের বেলায় তাজা ডাল বা শিকড় দ্বারা মিসওয়াক করাতে, রোযার কোনো ক্ষতি হয় না। যদিও ওই ডাল বা শিকড়ের স্বাদ মুখে বা গলায় বোঝা যায়'। এটিও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত (জাদীদ ফিকহি মাসাইল: ১/১৮৮)।

রোযা অবস্থায় দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হওয়াতেও রোযার কোনো ক্ষতি হয় না। তবে যথাসাধ্য ফরয গোসল করে পবিত্র হয়ে যাওয়া উত্তম (জাদীদ ফিকহি মাসাইল: ১/১৮৮)।

রোযা অবস্থায় টিভি, নাটক, সিনেমা ও নাচ-গান দেখা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। তার কারণ, রমযানের উদ্দেশ্য হল তাকওয়া অর্জন ও আত্মশুদ্ধি; অথচ ২/১টি ব্যতিক্রম ব্যতীত এগুলোর অধিকাংশই রোযার উদ্দেশ্য ও শিক্ষা পরিপন্থী। এ সব দ্বারা সিয়াম সাধনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণের পরিবর্তে বরং সরাসরি তা ব্যাহত হয়। তারপরও তেমন অবৈধ ও অশালীন গান-বাজনা, সিনেমা, নাটক ও টিভি ইত্যাদি দেখা বা শোনার কারণে ফরয রোযা নষ্ট হবে না; যদিও শক্ত গুনাহ হবে বটে (রাদ্দুল মুহতার)।

এসব টিভি, নাটক ও সিনেমা ইত্যাদির বিধান হল, যা কিছু সাধারণভাবে খোলা চোখে দেখা ও শোনা জায়েয হয় তা এসব মাধ্যমেও দেখা ও শোনা জায়েয

হয়ে থাকে; আর যা কিছু এমনিতেও দেখা ও শোনা বৈধ হয় না, সেসব এসব মাধ্যমের সাহায্যেও দেখা ও শোনা বৈধ হয় না (সূরা লোকমান এর ৬নং আয়াতের তরজমা ও তাফসীরসহ আরও অনেক হাদিস দ্রষ্টব্য)।

আর গানের বিধান হল, তা শরীয়তবিরোধী না হওয়া, ভাষা ও ভাব মার্জিত হওয়া, ফিতনা সৃষ্টিকারী না হওয়া, দেশ-জাতি-রাষ্ট্রের স্বার্থ পরিপন্থী না হওয়া; এবং তার সঙ্গে নাচ ও বাজনার সংযুক্তি না থাকা (প্রাগুক্ত)।

'ভুলে পানাহার করলে যেমন রোযা নষ্ট হয় না, তেমনি ভুলবশত দিনের বেলায় ঔষধ সেবন করে নিলে তাতেও রোযা নষ্ট হবে না।'

'সাহরী খাওয়া কালীন পানাহাররত অবস্থাতেই সুবহে-সাদেক হয়ে যাওয়ার বিষয়টি জানা গেল বা কেউ সংবাদ দিল; সেক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক পানাহার বন্ধ করে দিলে সেই রোযা সহীহ হয়ে যাবে; সেটি আর কাযা করতে হবে না। কিন্তু তেমনটি জানার পরেও, কিংবা নির্ভরযোগ্য কারও মাধ্যমে অবহিত হওয়ার পরও তাৎক্ষণিক পানাহার বন্ধ না করে মুখের লোকমা খেয়ে নিলে বা আরও ২/১ লোকমা খেয়ে নিলে কিংবা কমবেশী পানি ইত্যাদি পান করে থাকলে, সেই রোযাটিও পূর্ণ করতে হবে এবং রমযান পরবর্তীতে সেটি কাযাও করে নিতে হবে' (আযীযুল ফাতাওয়া: পৃ-৩৮৬, দারুল-ইশা'আত, করাচী)।

'রোযা অবস্থায় দিনের বেলায় স্ত্রীর সঙ্গে কোলাকুলি, চুমু খাওয়া ও মাখামাখিতে রোযা ভঙ্গ হয় না; তবে তাতে যদি বীর্যপাত হয়ে যায় (সঙ্গম ব্যতীত) তা হলে ওই রোযাটি কাযা করতে হবে; কাফফারা আদায় জরুরী হবে না। কিন্তু ওই অবস্থাতে যদি সঙ্গমও করা হয়; সেক্ষেত্রে কাযা ও কাফফারা উভয়টি ফরয হয়ে যাবে' (আযীযুল ফাতাওয়া: পৃ-৩৮৫, দারুল-ইশা'আত, করাচী)।

'মাহে রমযানে রোযা রাখা অবস্থায় তাস খেলা, পাশা খেলা, দাবা ইত্যাদি অনুমোদিত নয়– এমন সব খেলার কারণে রোযা নষ্ট হবে না বটে; কিন্তু তাতে রোযার সওয়াব কমে যাবে। অবশ্য ব্যায়াম হয় ও শারীরিক শক্তি, সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়; অথচ তাতে আবার নামায-রোযা ও জরুরী কোনে কাজেরও বিঘ্ন না ঘটে; সেক্ষেত্রে তেমন কোনো খেলার দরুন রোযা নষ্টও হবে না, সওয়াবও হ্রাস পাবে না; বরং নেক নিয়তের দরুন অতিরিক্ত সওয়াবও পাওয়া যেতে পারে' (আযীযুল ফাতাওয়া: পৃ-৩৮৯, দারুল-ইশা'আত, করাচী, ইত্যাদি)।

রোযা অবস্থায় হোক্কা পান ও তামাকপাতা (নিসওয়ার) সেবনে রোযা ভঙ্গের কারণ হল: যদিও কোনো বস্তু কেবল মুখের ভেতরে প্রবেশ করলেই রোযা ভেঙ্গে যায় না বরং তা মস্তিষ্কে বা পাকস্থলিতে পৌঁছতে হয়; যে-কোনোভাবেই হোক; তা গিলে ফেলার দ্বারাই হোক বা অন্য কোনোভাবেই হোক; কেবল গিলে

ফেলার দ্বারাই হতে হবে– তেমনটি জরুরী নয়। যে কারণে ঔষধ সেবন প্রশ্নে নাক দ্বারা নস্যি টানা এবং হোক্কাপানে সর্বসম্মতিক্রমে রোযা ভেঙ্গে যায়; যদিও তা গলা'র মাধ্যমে গিলে ফেলার মাধ্যমে হচ্ছে না। যেহেতু মূল ভিত্তি বা বিবেচ্য বিষয়, রোযা ভেঙ্গে যায় এমন কিছু যেখানে মস্তিষ্কে বা পাকস্থলিতে পৌঁছবে, নিঃসন্দেহে রোযা ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং হোক্কা, নিসওয়ার ইত্যাদি সেবনের দ্বারাও অবশ্যই রোযা নষ্ট হবে (ইমদাদুল মুফতীন: পৃ-৪৯৩-৪৯৪; দারুল ইশা'আত, করাচী : সূত্রঃ আলমগীরী ও খোলাসাতুল ফাতাওয়া ইত্যাদি)।

'ভুলে পানাহারের অনুরূপ ভুলবশত যদি স্বামী-স্ত্রী সহবাস করে ফেলে, তাতেও রোযা ভঙ্গ হয় না। এমনকি ভুলে একাধিকবার পানাহার করলেও রোযা ভাঙ্গে না' (ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খ-১, পৃ- ১৩০)।

'মাহে রমযানে কোনো রোযাদারকে ভুলে পানাহার করতে দেখলে, কী করণীয়? যদি লোকটিকে এমন শক্তিশালী বা সুস্থ-সবল বলে মনে হয় যে, তার মত লোকের রোযা পালনে তেমন কষ্ট হবার কথা নয়; তা হলে সেক্ষেত্রে তাকে রোযার কথা মনে করিয়ে দেয়া ওয়াজিব। আর যদি এমন হয় যে, দেখতেই মনে হচ্ছে লোকটি রোগা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা অসমর্থ; তা হলে কিছু বলতে বা সতর্ক করতে যাবে না' (আল-বাহরুর রায়িক : খ-১, পৃ-২৭১+ ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খ-১, পৃ- ১৩০)।

'গলার ভেতরে মশা বা মাছি প্রবেশ করলো, অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে ধোঁয়া ঢুকে পড়লো, অথবা ধুলো-বালি ঢুকে পড়লো; তাতেও রোযা ভাঙ্গবে না। কিন্তু এসব প্রবেশের ক্ষেত্রে যদি নিজের ইচ্ছার দখল থাকে, তা হলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে' (শরহুত তানভীর: খ-২, পৃ-১৫৬)।

'আগরবাতি বা লোবান ইত্যাদি জ্বালিয়ে যদি তার ধোঁয়া/ঘ্রাণ নেয়া বা গ্রহণ করা হয়, তা হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে; কিন্তু ধোঁয়া নেই কেবল ঘ্রাণ আছে যেমন গোলাপ ফুল/গোলাপজল ইত্যাদির ঘ্রাণ নেয়াতে রোযার কোন ক্ষতি নেই' (প্রাগুক্ত)।

'মুখের মধ্যে পান রেখে শুয়ে পড়লো, তারপর সুবহে-সাদেক হয়ে যাওয়ার পর ওই অবস্থায় জাগ্রত হল; তা হলে ওই রোযার কাযা করতে হবে' (শরহুত তানভীর +রাদ্দুল মুহতার: খ-২, পৃ-১৬২)।

'নিজের ইচ্ছা ব্যতীত এমনিতেই বমি হল, তাতে রোযা নষ্ট হবে না; হোক তা কম বা বেশি' (শরহুত তানভীর: খ-২, পৃ-১৭৮)।

'কেউ কোন নুড়িপাথর বা লোহার টুকরো ইত্যাদি কোন এমন বস্তু খেয়ে ফেলল, যা খাদ্য হিসাবে খাওয়া হয় না অথবা কেউ তা ঔষধরূপেও সেবন করে না; তাতেও তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য তার ওপর কাফফারা জরুরী হবে

না; কেবল কাযা রাখতে হবে। আর যদি এমন কিছু খায় যা লোকজন সাধারণত খায় না; তবে প্রয়োজনে ঔষধরূপে খেয়ে থাকে বা পান করে থাকে– তেমন কিছু খেলে, তাতেও রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে' (শরহুল-বিদায়াহ্: খ-১, পৃ-২০১)।

ঈদের নামাযের নিয়ম

প্রথমে মুখে বা মনে মনে নিয়ত করে নেবে, ঈদুল-ফিতর এর দু'রাকাত ওয়াজিব নামায অতিরিক্ত ছয় তাকবীরসহ ইমামের সঙ্গে পড়ছি। তাপর 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বেঁধে নেবে এবং সানা পড়বে। তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাকবীরে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ছেড়ে দেবে এবং চতুর্থ তাকবীরে হাত উঠিয়ে বেঁধে নেবে। তারপর স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম রাকাত শেষ করবে। দ্বিতীয় রাকাতে ফাতিহা ও সূরা পাঠ শেষে ইমাম যখন তাকবীর বলবেন, তাঁর সঙ্গে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাকবীরে হাত কান পর্যন্ত উঠাতে হবে এবং ছেড়ে দিতে হবে। আর চতুর্থবার তাকবীর বলে হাত না উঠিয়ে সোজা রুকুতে চলে যেতে হবে। বাকিটুকু যথা নিয়মে শেষ করে খোৎবা শুনে, দু'আ-মুনাজাত করে বাসা-বাড়িতে ফিরে যেতে হবে।

মহান আল্লাহ্ মাহে রামাদানের উক্তসব আমল-ইবাদতে যথাসাধ্য আমাদের অংশগ্রহণের এবং সংশ্লিষ্ট বিধানগুলো মেনে চলার তাওফিক দিন, আমীন!♦

বাঙালির জীবনে পহেলা বৈশাখ

আখতার হামিদ খান

এসো হে বৈশাখ, এসো এসো
তাপস নিঃশ্বাস বায়ে
মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক যাক
এসো এসো....
[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

পহেলা বৈশাখ বাংলা পঞ্জিকার প্রথম মাসের প্রথম দিন। দিনটি বাংলাদেশসহ বিশ্বের বাংলাভাষী মানুষ নববর্ষ হিসেবে পালন করে থাকে। সে হিসেবে এটি বাঙালিদের সর্বজনীন উৎসব। পুরাতন বছরের সব আবর্জনা দূর করে নববর্ষে মানুষ নতুন সাজে সাজে। এ উৎসবে সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ ভেদাভেদ ভুলে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান গেয়ে বৈশাখকে বরণ করে নেয়। কবির গানের মতোই সব গ্লানি মুছে, সব জরা ঘুচিয়ে বৈশাখের অগ্নিস্নানে পৃথিবী শুদ্ধ-শুচি হোক– এটাই মানুষের প্রত্যাশা থাকে। সবার কামনা থাকে নতুন বছরটি যেন সুখময় ও সমৃদ্ধিশালী হয়। এদিন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ছুটি থাকে। হিজরি সন চাঁদের হিসাবে আর খ্রিষ্টীয় সাল ঘড়ির হিসাবে চলে। এ কারণে হিজরি সনে নতুন তারিখ শুরু হয় সন্ধ্যায় নতুন চাঁদের আগমনে। ইংরেজি তারিখ শুরু হয় মধ্যরাতে। ঐতিহ্যগতভাবে সূর্যোদয় থেকে বাংলা দিন গণনার রীতি। হিন্দু সৌর পঞ্জিকা অনুসারে বাংলা বারোটি মাস অনেক আগে থেকেই পালিত হতো। এই সৌর পঞ্জিকা শুরু হতো গ্রেগরীয় পঞ্জিকার এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি হতে। বর্তমানে পহেলা বৈশাখ নতুন বছরের সূচনার নিমিত্তে উদযাপিত একটি সর্বাজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। এক সময় এমন ছিল না। তখন নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে পালিত হতো। এর মূল তাৎপর্য ছিল কৃষি কাজ। পূর্বে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের যুগ শুরু না হওয়ায় কৃষকদের ঋতুর উপরই নির্ভর করতে হতো। ভারতবর্ষে মুগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সম্রাটেরা হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে কৃষি পণ্যের খাজনা আদায় করতেন। কিন্তু হিজরি সন চাঁদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় তা কৃষি ফলনের সাথে মিলত না। এতে অসময়ে কৃষকদের খাজনা পরিশোধে বাধ্য করা হতো। খাজনা আদায়ে শৃঙ্খলা প্রণয়নের লক্ষ্যে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। তিনি মূলত প্রাচীন বর্ষপঞ্জিতে সংস্কার আনার আদেশ দেন। তাঁর আদেশ অনুসারে তৎকালীন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ফতেহউল্লাহ সিরাজি সৌর সন এবং হিজরি সনের ওপর ভিত্তি করে নুতন বাংলা সন বিনির্মাণ করেন। আর এই গণনা পদ্ধতি কার্যকর হয় ২য় আকবরের সিংহাসন আরোহণের সময় (৫ই নভেম্বর, ১৫৫৬) থেকে। প্রথমে এই সনের নাম ছিল ফসলি সন– পরে বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিত হয়। আকবরের সময় থেকেই পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয়। তখন প্রত্যেককে চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সব খাজনা, মাশুল ও শুল্ক পরিশোধ করতে হতো। এর পরদিন পহেলা বৈশাখে ভূমির মালিকেরা নিজ নিজ অঞ্চলের আদিবাসীদের মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়ন করতেন। এ উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করা হতো। একই ধারাবাহিকতায় ১৬০৮ সালে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নির্দেশে সুবেদার ইসলাম খাঁ চিশতি ঢাকাকে যখন রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলেন, তখন থেকেই রাজস্ব আদায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব নিকাশ শুরু করার জন্য বাংলা বছরের প্রথম দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখকে উৎসবের দিন হিসেবে পালন করা শুরু হয়। ঐতিহাসিক তথ্যে আছে যে, সম্রাট আকবরের অনুকরণে সুবেদার ইসলাম চিশতি তার

বাসভবনের সামনে সব প্রজার শুভ কামনা করে মিষ্টি বিতরণ এবং বৈশাখ উৎসব পালন করতেন। সেখানে সুবেদার হতে শুরু করে জমিদার, কৃষক, ব্যবসায়ীরা উপস্থিত থাকত। প্রজারা খাজনা নিয়ে আসত। সেই উপলক্ষে সেখানে খাজনা আদায় ও হিসাব-নিকাশের পাশাপাশি চলত মেলা, গান-বাজনা, গরু-মোষের লড়াই, কাবাডি খেলা ও হালখাতা অনুষ্ঠান। পরবর্তীকালে ঢাকা শহরের মিটফোর্ড, ভাওয়াল রাজার কাছারি বাড়ি, বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী ঢাকার নবাবদের আহসান মঞ্জিল, ফরাসগঞ্জের রূপলাল হাউস বিভিন্ন স্থানে নবাবদের পুণ্যাহ অনুষ্ঠান হতো। প্রজারা নতুন জামাকাপড় পরে জমিদার বাড়ি খাজনা দিতে আসত। জমিদারেরা আঙিনায় এসে প্রজাদের সাথে কুশল বিনিময় করতেন। সবশেষে ভোজপর্ব দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হতো। সেসময় এই দিনের প্রধান ঘটনা ছিল একটি হালখাতা তৈরি করা। হালখাতা বলতে একটি নতুন হিসেব বই বোঝানো হতো। প্রকৃতপক্ষে হালখাতা হলো বাংলা সনের প্রথম দিনে দোকানগুলোর হিসাব আনুষ্ঠানিকভাবে হালনাগাদ করার প্রক্রিয়া। গ্রাম, শহর, বাণিজ্যিক এলাকা, সব এলাকায়ই পুরনো বছরের হিসাব বই বন্ধ করে নতুন হিসাব বই খোলা হতো। এই প্রথাটি স্বর্ণের দোকানসহ বিভিন্ন দোকানে বর্তমানেও প্রচলিত আছে। এভাবে নববর্ষের উৎসবটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। যার রূপ পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে এই পর্যায়ে এসেছে। নতুন বছরের উৎসবের সঙ্গে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। গ্রামের মানুষ ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে। তারপরে নতুন জামাকাপড় পরে এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে বেড়াতে যায়। প্রত্যেকের বাড়িতে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থাও থাকে। কোথাও খেলার মাঠে আয়োজন করা হয় বৈশাখি মেলা। মেলাতে নানারকম কুটির শিল্পজাত সামগ্রীর বিপণন হয়। থাকে নানারকম পিঠার আয়োজন। অনেক স্থানে ইলিশ মাছ দিয়ে পান্তা ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এই দিনের একটি পুরনো সংস্কৃতি হলো গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। যেমন– নৌকাবাইচ, লাঠি কিংবা কুস্তি প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। বাংলাদেশে এরকমের কুস্তির বড় আসরটি হয় ১২ বৈশাখ চট্টগ্রামের লালদিঘি মাঠে। এটি 'জব্বারের বলি খেলা' নামে পরিচিত। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহর পহেলা বৈশাখের মূল অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু। রমনার বটমূলে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের গানের মাধ্যমে নতুন বছরের সূর্যকে অভিনন্দন জানানো হয়। বৈশাখের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ানটের শিল্পীরা সম্মিলিত কণ্ঠে গান গেয়ে নতুন বছরকে আহ্বান জানান। ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন ও সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ১৯৬৭ সাল থেকে ছায়ানটের এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের

সূচনা হয়। ঢাকার বৈশাখি উৎসবের একটি আবশ্যক অঙ্গ মঙ্গল শোভাযাত্রা। নববর্ষ উদযাপনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে বৈশাখের সকালে শোভাযাত্রা শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় চারুকলা ইনস্টিটিউটে গিয়ে শেষ হয়। এই শোভাযাত্রায় গ্রামীণ জীবন এবং আবহমান বাংলাকে ফুটিয়ে তোলা হয়। শোভাযাত্রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাসহ নানা স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও শহরের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অর্থাৎ তরুণ-তরুণীরা অংশগ্রহণ করে। এবারের শোভাযাত্রার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, 'জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে'। প্রতিবছর শোভাযাত্রার জন্য বানানো হয় রং-বেরঙের মুখোশ, বাঘ-ময়ূর, বিড়ালের মুখে চিংড়ি মাছ, মাছের ঝাঁক, মা ও শিশু, গাঁয়ের বধূ, টেপা পুতুল, বাঘের পিঠে রাজকুমার, লক্ষ্মীপেঁচা, হরিণশাবক ইত্যাদি প্রাণীর 'মোটিভ'। এসব আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি ও ভালোবাসার প্রতীক। যা কয়েক বছর ধরে নববর্ষের একটি অন্যতম আকর্ষণ হয়ে আছে। প্রতিবছর সোনারগাঁয়ে ব্যতিক্রমধর্মী এক মেলা বসে– যার নাম বউমেলা। সোনারগাঁয়ের জয়রামপুরে প্রায় একশ বছর ধরে এই মেলা চলে আসছে। এই মেলা পাঁচ দিনব্যাপী চলে। একটি বটবৃক্ষের নীচে এই মেলা বসে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা রয়েছে, যাদের প্রত্যেকেরই বছরের নতুন দিনে উৎসব রয়েছে। যেমন– ত্রিপুরাদের বৈশুখ, মারমাদের সাংগ্রাই ও চাকমাদের বিজু উৎসব। বর্তমানে তিনটি জাতিই যৌথভাবে 'বৈসাবি' উৎসব পালন করে। উৎসবের নানা দিক রয়েছে। এরমধ্যে একটি হলো পানি উৎসব। চৈত্রের শেষ দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন পালিত হয় চড়ক পূজা– অর্থাৎ শিবের উপাসনা। এদিন বিভিন্ন অঞ্চলে আয়োজিত হয় চড়ক মেলা। এই মেলায় অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন শারীরিক কসরৎ প্রদর্শন করে মানুষের মনোরঞ্জন করে থাকে। এছাড়া অনেক পরিবারে বর্ষ শেষের দিন টক ব্যঞ্জন রান্না করে থাকে। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও যা মানুষের জীবন থেকে অশান্তি দূর করার প্রথা হিসেবে পরিচিত। বৈশাখের সঙ্গে বাঙালির জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। নবান্নের পর মানুষ এ মাসে যেন কর্মক্লান্ত জীবনের অনাবিল স্বস্তি ফিরে পায়। কারোই খেত-খামারে যেতে হবে না। সবারই অনেকটা অবসর জীবন। আগে একসময় গ্রামে নববর্ষে সন্ধ্যাবেলা গানের আসর বসত। সে আসরে পালাগান ও পুঁথি পাঠ করা হতো। এখন সেই দিন আর নেই। হালখাতাও এখন আর আগের মতো নেই বললেই চলে। কিন্তু দেশজুড়ে পহেলা বৈশাখের মিলনমেলা আপামর জনতার উৎসবের আমেজে অম্লান। নববর্ষে মানুষ সকাল-সন্ধ্যা হয়ে ওঠে উৎসবমুখর, জীবনের মাঝে খুঁজে পায় আস্বাদ,

আরো পায় নতুন করে জীবন চলার পথের প্রেরণা। তাই বাঙালির জীবনে বৈশাখের আবেদনই অন্যরকমের।

জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেয়ে গাঁয়ের মানুষের জীবনে বৈশাখ দেয় আনন্দবৃষ্টি। এ বৃষ্টিধারায় স্নান করে পূর্ণ উদ্যমে পরের মাসগুলোতে মানুষ কর্মমুখর জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এটাই বাঙালির জীবনের বৈশিষ্ট্য। বৈশাখে উৎসবের ঢল নেমে আসে শহরের যান্ত্রিক জীবনেও। নববর্ষে মেলা বসে রমনা পার্ক, ধানমন্ডি লেক, সংসদ ভবনসহ বাংলাদেশের সব শহর, নগর ও গঞ্জে। কত না বিচিত্র হাতের তৈরি দ্রব্য সম্ভার! সেসব, দ্রব্য মেলায় বিক্রি করা হয়। সুন্দর সুন্দর দ্রব্য সামগ্রীতে বাংলার। মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবনধারার একটা স্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে। বৈশাখি মেলা যেন এদেশের মানুষের প্রতিচ্ছবি। মানুষের জীবনের আনন্দবেদনা খণ্ড খণ্ড হয়ে ধরা পড়ে তাদের হাতের কাজে। মাটির পুতুল, পাটের শিকা, তালপাতার পাখা, সোনার পাখি, বাঁশের বাঁশি, ঝিনুকের ঝাড়, পুঁতির মালা, মাটির হাড়ি, কাগজের পাখি, বাঘ-সিংহ কত যে অদ্ভুত সব সুন্দর সুন্দর জিনিসের সমাবেশ মেলায়! এসব চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হবে না যে বাংলাদেশের মানুষ এত শিল্পীমনা। মানুষ অসচ্ছল হতে পারে কিন্তু রূপপিপাসু বাঙালির মন জীবন জটিলতা থেকে দূরে থাকে। বৈশাখ মানুষের মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। বসন্তে কোকিলের কুহুতান শেষ হয়ে গেলে আসে গ্রীষ্ম। গ্রীষ্মের দাবদাহ মানুষের জীবন বিচলিত করতে পারে না। মানুষ একা খুশি মনে গান গায়, যৌথভাবে গানের আয়োজন করে। পহেলা বৈশাখ যেন এদেশের মানুষের জীবনীশক্তি। জাতিগতভাবেই বাঙালি ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির দেশ। সামাজিকভাবে এদেশে নানা অনুষ্ঠান হয়। এসব অনুষ্ঠানে নানা গান পরিবেশিত হয়। সেসব গানে থাকে

বাংলার মানুষের প্রাণের কথা। মাঠের গান, নদীর মাঝির গান, লোকগান-এসবে প্রকাশ পায় বাংলার মানুষের সহজ-সরল অনুভূতি। এ সংগীত চিরায়ত। এসব সংগীতে আছে মাটির কাছাকাছি মানুষের প্রাণের ছোঁয়া। হাসি-কান্না, মিলন-বিরহ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এ সংগীতের মূল। গ্রাম্য প্রকৃতি আর পল্লির মানুষের মনের কথা– এই দুইয়ের মিলনে নির্মিত বৈশাখের গান। বৈশাখের গান সৃষ্টির মূলে রয়েছে কৃষক, জেলে, মাঝির মতো গ্রাম্য মানুষের প্রাণের আর্তি আর হৃদয়ের উত্তাপ। এ গানে কোনো কৃত্রিমতা নেই। নানা কবি, সাহিত্যিক বৈশাখকে নিয়ে রচনা করেছেন প্রবন্ধ-গান-কবিতা। নববর্ষের গানের বাণীতে গ্রীষ্মের রূপ ফুটে ওঠে। যেমন– এমনি দিনে তোমায় ভালোবেসে মরতে চাই। যেখানে গোধূলি মিশে/ তুমি আমি দেখা হবে বৈশাখি খেলার মাঠে।

ঝড় এল এল ঝড়/ আম পড় আম পড়/ কাঁচা আম পাকা আম। টক টক মিষ্টি এল বুঝি বৃষ্টি। এই যা........ এক বৈশাখে দেখা হলো দুজনার/ জোষ্টিতে হলো পরিচয়/ আসছে। আষাঢ় মাস, মন তাই ভাবছে/ কী জানি কী হয়.... ব্যান্ডের এই গানটি বাঙালি তরুণ-তরুণীদের হৃদয় কেড়েছে। যেমন– 'জেগেছে বাঙালির ঘরে ঘরে এ কী মাতম দোলা/ জেগেছে সুরেরই তালে তালে হৃদয় মাতম দোলা/ বছর ঘুরে এল আরেক প্রভাত নিয়ে/ ফিরে এল সুরের মঞ্জুরি/ পলাশ শিমুল গাছে লেগেছে আগুন/ এ বুঝি বৈশাখ এলেই শুনি। মেলায় যাইরে, মেলায় যাইরে...।' পুরাতনের সাথে নতুনের যে যোগাযোগ পহেলা বৈশাখ তারই যোগসূত্র। বৈশাখের ভোরের হাওয়া বাংলার চিরন্তন রূপের বর্ণালি ছড়ায় মানুষের মনে। তাই বাংলাদেশে মানুষ হৃদয়ের অমৃত বাণী দিয়ে বৈশাখকে বরণ করে সুরেলা কণ্ঠে বলে– স্বাগতম হে বৈশাখ! প্রায় সব দেশে, সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে, সব সংস্কৃতিতেই নববর্ষ উদযাপনের এই প্রথা প্রচলিত আছে। অবশ্য উদযাপন রীতি-প্রকৃতির মধ্যে তারতম্য আছে। তবু সব ক্ষেত্রেই একটি মৌলিক ঐক্য আমাদের চোখে পড়ে, তা হলো: নবজন্ম বা পুনরুজ্জীবনের ধারণা-পুরনো জীর্ণ এক অস্তিত্বকে বিদায় দিয়ে সতেজ সজীব এক নবীন জীবনের মধ্যে প্রবেশ করার আনন্দানুভূতি। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব বাংলা নববর্ষ উদযাপন আমাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে অপরাজেয় শক্তি ও মহিমায় পূর্ণ করুক– এই হোক আমাদের কামনা। সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা!♦

রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান

বাংলা সন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ

মুস্তাফা মাসুদ

বাংলা নববর্ষ মূলে একটি ফসলি সন অর্থাৎ ফসল চাষাবাদ আর রাজসরকারে খাজনা পরিশোধ সূত্রেই তার সৃষ্টি। কালে সেই কৃষিভিত্তিক সনটিই হয়ে গেছে বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনার এক বেগবান উৎস।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হওয়ার পর ধর্মের ভিত্তিতে প্রায় বারোশো মাইল ব্যবধানের দুটি ভূখণ্ড একটি অখণ্ড রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় এলো, এর নাম পাকিস্তান; তার দুটি অংশ– পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। কিন্তু যে-চেতনার প্রণোদনায় পাকিস্তানের সৃষ্টি, সূচনা থেকেই তার ব্যত্যয় ঘটতে শুরু করল। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসনে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাধান্য এবং একটা কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বিলম্ব করল না। পূর্বাংশের মানুষদের দাবিয়ে রাখার এবং তাদেরকে হীন জ্ঞান করার প্রবণতা থেকেই প্রথম আঘাতটি এল মাতৃভাষা বাংলার ওপর।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই ভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাথে বাঙালিদের মতভেদ শুরু হয়। পূর্ব বাংলা বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা পুরো পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬% আর তাদের মাতৃভাষা বাংলা। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সেই হার ৪৪%। অথচ তারা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মানতে চাইল না। তারা ঘোষণা করল, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় গঠিত গণতান্ত্রিক যুবলীগের কর্মীসম্মেলনে বাংলা ভাষা সংক্রান্ত কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করেন তৎকালীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। প্রস্তাবগুলো উত্থাপনের

পর তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের লেখার ভাষা, আইন-আদালত এবং প্রশাসনিক ভাষা বাংলা হবে বলে এই কর্মীসম্মেলন প্রস্তাব করছে। বাংলা ভাষার দাবির প্রশ্নে এটাই ছিল প্রথম সোচ্চার উদ্যোগ। তখন থেকেই উপলব্ধি করা গিয়েছিল যে, বাংলা ভাষাকে অবহেলাই শুধু নয়; বাঙালির নিজস্বতা– তার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যও অবহেলা-অবজ্ঞার শিকার হবে। একারণেই মাতৃভাষার মর্যাদার প্রশ্নে সচেতন ছাত্র-সমাজ আন্দোলন বেগবান করতে চাইলেন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি শেখ মুজিবের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হয়। এই সংগঠনের ১০-দফা দাবির মধ্যে অন্যতম ছিলো বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি। একই বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার দাবির আন্দোলন বেগবান করার লক্ষ্যে ধর্মঘট ডাকা হয়। ১৯৪৮ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বৈঠকে পাকিস্তানিদের বৈরী মনোভাব ও বাংলাভাষা-বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিষয় একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। এদিন করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের (এখনকার জাতীয় সংসদ) অধিবেশনে পরিষদ-সদস্যদের উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। এ সময় উর্দুর পাশাপাশি বাংলায় বক্তৃতা দেয়ার দাবি তোলেন পরিষদের বাঙালি সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি প্রস্তাব সংশোধনের দাবি তোলেন এবং বাংলাকে জাতীয় পরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। এর সপক্ষে তিনি যুক্তি তুলে ধরেন যে, পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লাখের (অর্থাৎ শতকরা ৫৬ ভাগ) বসবাস পূর্ব পাকিস্তানে এবং তাদের মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার পক্ষে কোনো যুক্তিই মানল না। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অর্থাৎ বাঙালিদের মাতৃভাষার কোনো সম্মান দেয়া হল না। পরিষদে বাংলায় বক্তৃতা দিতেও দেয়া হল না। উল্টো উর্দুই হবে পাকিস্তান গণপরিষদের (জাতীয় সংসদের) ভাষা– গণপরিষদে এই প্রস্তাবই গৃহীত হল। উল্লেখ্য, গণপরিষদের ওই বৈঠকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানসহ অন্যদের পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনও সরাসরি বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। নাজিমুদ্দিন তার ভাষণে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে মানুষ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে রাজি আছে!

এরই ধারাবাহিকতায় এল ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ– যেদিন সচিবালয়ের সামনে ধর্মঘটরত ছাত্রদের গ্রেফতার করা হল। ২১ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্না ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে ঘোষণা দিলেন যে, উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এই ঘটনা আগুনে ঘি-ঢালার মতো অবস্থা সৃষ্টি করল। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন তুঙ্গস্পর্শী হলো। কিন্তু তাদের সেই ন্যায্য দাবির আন্দোলনকে অবশেষে রাইফেলের গুলির আঘাতে স্তব্ধ করার পদক্ষেপ নেওয়া হলো। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদী ছাত্র-জনতার ওপর নির্মমভাবে গুলি চালানো হলো। এতে শহিদ হলেন সালাম,

বরকত, জব্বার, শফিউর প্রমুখ। মাতৃভাষার জন্য এই প্রাণদান বুঝিয়ে দিল– মাতৃভাষার মতো তার নিজস্ব সংস্কৃতি-ঐতিহ্য আর পরিচয় তার কাছে কতটা প্রিয়; আর এভাবেই, বাংলা ভাষার মর্যাদার প্রশ্নে পরিষ্কার হয়ে গেল– বাঙালিরা একটি স্বতন্ত্র ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর জাতিসত্তার অধিকারী, যাকে অবহেলা-অবজ্ঞা কিংবা দমিয়ে রাখা হবে আত্মঘাতী।

বঙ্গবন্ধু: বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রাণপুরুষ

ভাষা-প্রশ্নের পাশাপাশি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনাও ততদিনে শুরু হয়ে গেছে। তার বিপরীতে প্রতিবাদ-প্রতিরোধও জোরদার হয়েছে ক্রমে ক্রমে। যুক্তফন্ট নির্বাচনে বাঙালির বিজয় তার উজ্জ্বল বহির্প্রকাশ। এরপর টেক্সট বুক বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকে বাঙালি সংস্কৃতিবিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বাষট্টির শিক্ষা-আন্দোলন, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের ছেষট্টির ছয়দফা আন্দোলন, আটষট্টির তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং অতঃপর উত্তুঙ্গ গণ-আন্দোলন। এরই ফাঁকে ১৯৬১ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপনের উদ্যোগকে থামিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলল; যদিও সে-অপচেষ্টা সফল হল না প্রগতিশীল বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীদের সাহসী প্রচেষ্টায়। ড. আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় তখন প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ওপর বৃহদায়ন সঙ্কলন-গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ'। এছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধের পাশাপাশি প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাইকে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' লেখার অনুরোধের মতো হাস্যস্পদ ও ন্যাক্কারজনক ঘটনাও তখন ঘটেছিল বলে শোনা যায়। বাংলা ভাষার প্রতি

অবহেলা, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য-বঞ্চনার সঙ্গে যুক্ত হল বাংলা ভাষার প্রধান কবি রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের অপচেষ্টা। রবীন্দ্র-বর্জনকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি সরাসরি আঘাত হিসাবেই দেখা হল। সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বাংলা বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখের সাংস্কৃতিক উৎসব। এটি বাঙালির নিজস্ব জিনিস; ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও তাদের দোসর-মিত্ররা নববর্ষ উৎসবকে বিদ্বেষপূর্ণ নজরে দেখত; এই উৎসবকে তারা 'হিন্দুয়ানি' কালচার তথা মুসলিম ঐতিহ্য-বিরোধী বা ইসলাম-বিরোধী বলে বিবেচনা করত। নববর্ষ উৎসব-বৈরীদের সম্পর্কে প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক, গবেষক আতোয়ার রহমানের ভাষ্য এমন: "এ বস্তু বাংলাদেশের একেবারে নিজস্ব, অতি প্রকটভাবে দেশজ। আর সেই জন্যেই তো এদেশের শত্রুরা একদা পয়লা বৈশাখের উৎসবকে ভয়ের চোখে দেখেছে আর বারবার এ উৎসব বন্ধ করে দিতে চেয়েছে।... পাকিস্তানি আমলের প্রথম দিকে, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনেরও আগে, পয়লা বৈশাখের মাটি-ঘেঁষা উৎসব দেখে স্থানীয় কোনো দৈনিক পত্রিকা একবার সম্পাদকীয় লিখেছিল, 'পাকিস্তানী হুঁশিয়ার'। অর্থাৎ আর চলবে না। দেশের মানুষ তাতে অবশ্যই হুঁশিয়ার হয়েছিল, কিন্তু পত্রিকাখানির কাঙ্ক্ষিত পথে নয়। তারা বরং সম্পাদকীয়টিকে তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার ওপর এক হামলা বলে ধরে নিয়ে আরো স্বাধিকার সচেতন হয়েছে। সেই সচেতনতার ফল পরবর্তীকালে পয়লা বৈশাখের সরকারি ছুটি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ। পয়লা বৈশাখের ওপর আবার হামলা চলে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়। এবারে বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষের সাথে পয়লা বৈশাখের ছুটির ওপরও খাঁড়া নামে। আর তার ফলে আমাদের প্রায় আড়াই দশকের স্বাধিকার সংগ্রাম আর স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে তার স্থান হয়ে যায় প্রতিষ্ঠিত।" *(শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত: বাংলা সন ও পঞ্জিকার ইতিহাস-চর্চা এবং বৈজ্ঞানিক সংস্কার, বাংলা একাডেমি, ২০১৪ গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ: বৈশাখ, পৃ. ১০৫)*

বস্তুত, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত রাজনৈতিক তথা স্বাধিকার আন্দোলনের পালে বেগবান হাওয়ার সঞ্চার করে বাংলা নববর্ষ-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক উৎসব। নববর্ষের প্রতি পাকিজস্তানি শাসকদের বিরূপ মনোভাবই এই ঐতিহ্যিক সাংস্কৃতিক উৎসবটিকে স্বাধিকার চেতনার মর্মমূলে প্রেরণাসঞ্চারী শক্তি হিসাবে স্থিত করে। জানা যায়, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বাঙালির বিজয় ও সাময়িকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের বছর ১৯৫৪ সালে ঢাকার নববর্ষ অনুষ্ঠানে নতুন উৎসাহ আর উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল। রাজনৈতিক জাগরণ সাংস্কৃতিক জাগরণকে সেদিন বেগবান করেছিল দারুণভাবে। কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, নববর্ষের সাংস্কৃতিক

উৎসবের প্রেরণা থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোও নতুন শক্তি ও প্রেরণা লাভ করে।

ছায়ানটের প্রথম সভাপতি কবি সুফিয়া কামাল

শামসুজ্জামান খান লিখেছেন: "..বাঙালির এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার আন্দোলন তার রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী ও স্বাধিকার আন্দোলনকে তীব্র গতিবেগ দান করে গুণগত পরিবর্তনের স্তরে উন্নীত করে। ১৯৬৪ সালে শেখ সাহেবের নতুন নির্দেশনা এর সঙ্গে যুক্ত হয়। 'পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা', এরপর ৬৬-তে শেখের ৬ দফা এবং 'জয় বাংলা' শ্লোগানের উদ্ভাবনা বাঙালিকে স্বাধীনতার তীব্র চেতনায় পাগলপারা করে তোলে। বাঙালিত্বের চেতনার তীব্র চাপে সে-বছর প্রাদেশিক সরকার (নববর্ষ উপলক্ষে) ছুটি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।.. সেদিন ঢাকার বিভিন্ন নববর্ষ অনুষ্ঠানে অভূতপূর্ব জনসমাগম হয়।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১৫।) এ কারণেই জাতীয়তবাদী প্রেরণাসঞ্চারী নববর্ষ উৎসবকে সুবিন্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় এনে দেশীয় সংস্কৃতির আশ্রয়ে আরো জনসম্পৃক্ত ও ব্যাপকবিস্তারী করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি হয়ে ওঠে। কারণ, রাজনৈতিক জাগরণের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক জাগরণ উত্তুঙ্গ না হলে রাজনৈতিক বিজয় কঠিন হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপলব্ধিও এব্যাপারে আগে থেকেই ইতিবাচক হওয়ায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পালে নতুন হাওয়া যুক্ত হয়; এবং প্রকারান্তরে তা তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামকে তুঙ্গস্পর্শী হতে সহায়তা করে। এই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট ১৯৬৭ সালে প্রথমবারের মতো রমনা বটমূলে বর্ষবরণ বা পহেলা বৈশাখ উদযাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। ছায়ানটের প্রথম সভাপতি ছিলেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল। সিধু ভাই, ওয়াহিদুল হকসহ অন্য প্রগতিশীল বাঙালি সংস্কৃতি কর্মীবৃন্দ এই সংগঠনের সঙ্গে ছিলেন। ছায়ানট আয়োজিত বর্ষবরণ

উৎসব ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে অভূতপূর্ব নবজাগরণের সূচনা করে; বাঙালির নিজস্ব ঐতিহ্যের স্মারক হিসাবে অসাম্প্রদায়িক এক জাতীয় উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করে।। আমরা জানি, গত শতকের মধ্যষাটের দশক বাঙালির অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে পরিচালিত আপসহীন, হার-না-মানা আন্দোলন-সংগ্রামের বছর। 'তোমার আমার ঠিকানা– পদ্মা মেঘনা যমুনা'– এই স্লোগান শুধু রাজনৈতিক উজ্জীবনীমন্ত্র ছিল না; নববর্ষকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক উৎসবকেও তা প্রাণিত করল বাঙালির স্বকীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রাজনৈতিক রাজনীতির উত্তুঙ্গ ধারার সঙ্গী হতে, পাশাপাশি চলতে। ওই স্লোগানের মর্মবাণী ছায়ানট পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছিল বলেই নববর্ষের অনুষ্ঠান হয়ে গেল বাঙালি চেতনার উজ্জীবনের সমার্থক। এভাবেই নববর্ষের অনুষ্ঠান বাঙালি জাতীয়তাদের সঙ্গেও একীভূত হয়ে গেল; এবং এক সময় তা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রশস্ত মোহনায় মিশে গিয়েছিল। আমাদের ধর্ম যার যার, কিন্তু দেশ সবার; দেশের সংস্কৃতি আর সব ইতিবাচক অর্জন সবই আমাদের সবার, এই দেশের সব মানুষের– কৃষক-মজুর-জেলে-তাঁতি-কর্মকার-চর্মকার-কারখানার শ্রমিক-নায়ের মাঝি-অফিসার-কর্মচারী-ধনী-গরিব সকলের। এই চেতনাই তো বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রাণভোমরা। সেই প্রাণভোমরাকে জাগাতে নববর্ষের অসামান্য অবদান আজ সবাই স্বীকার করেন। আর যে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী তা স্বীকার করে না, তারা এখনো বৈশাখের নববর্ষ উৎসবকে ভয় করে। থামিয়ে দিতে চায় এর অগ্রগমন। ভয় কেন? ওই পশ্চাতপদ, ধর্মান্ধ গোষ্ঠী সেই পাকিস্তানের সূচনালগ্নের মতো এখনো বিশ্বাস করে– নববর্ষের উৎসব হিন্দুয়ানি আর অনৈসলামিক। অতএব ঠেকাও। আগুন জ্বালো। বোমা ফাটাও। বিগত ২০০০ সালে রমনা বটমূলের বৈশাখী উৎসবে আমরা এই অন্ধকারের দানবদের পৈশাচিক বোমাবাজি দেখেছি; ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিপ্রিয় অনেকগুলো মানুষকে দেখেছি রক্তাক্ত লাশ হতে; দেখেছি আহত হয়ে আর্তচীৎকার করতে। নিরীহ মানুষ মেরে যারা তথাকথিত হিন্দুয়ানি বা অনৈসলামিক কালচারকে তাড়াতে চেয়েছিল, দেশের মানুষ তাদের সমর্থন করেনি। নববর্ষের অসাম্প্রদায়িক চেতনা তাদেরকে রুখে দিয়েছে। নিজস্ব স্বকীয়তায় ভাস্বর এক নিষ্কলুষ সাংস্কৃতিক উৎসব হিসাবে নববর্ষের অনুষ্ঠানমালা থেমে তো যায়ইনি; বরং বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার মর্মসঙ্গী হয়ে আরো শক্তি সঞ্চয় করেছে। এই শক্তি ছড়িয়ে পড়েছে শহরে-বন্দরে-নগর-গাঁয়ে। এ যেন সাস্কৃতিক উৎসবের আদলে আমাদের স্বকীয় অস্তিত্ব রক্ষার এক সুদৃঢ় প্রাচীর; তাকে ভাঙতে হলে বাঙালি-অস্তিত্বকে বিনাশ করতে হবে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীন বাংলাদেশে তা কি সম্ভব? ♦

মুজিবনগর থেকেই স্বাধীন সরকার

ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম

(মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের পরামর্শক ও বিশেষ সহায়ক)

স্বাধীন বাংলাদেশের সূতিকাগার হচ্ছে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল এই জায়গার নামকরণ করা হয় 'মুজিবনগর'। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ গর্বের সঙ্গে এই নামকরণ করেছিলেন। তখন সরকারি নথিতে লেটার হেডে লেখা থাকত 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুজিবনগর'। সরকারের ঠিকানা ছিল মুজিবনগর।

প্রতিবছরের ১৭ এপ্রিল, মুজিবনগরে সরকারিভাবে বিশেষ অনুষ্ঠান হওয়া উচিত বলে মনে করি। আমার ধারণা, এটি জনগণেরও প্রত্যাশা। মুজিবনগর দিবসে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশেষ অনুষ্ঠানের অনুপস্থিতি আমাকে পীড়া দেয়।

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে মুজিবনগর রাষ্ট্রীয়ভাবে চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। নতুন প্রজন্ম যাতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারে, সচেতন হতে পারে এবং গর্ববোধ করতে পারে, সে জন্য প্রতিবছরের ১৭ এপ্রিল সেখানে জাতীয়ভাবে উৎসবসহ নানা উপযুক্ত অনুষ্ঠান রাষ্ট্রীয়ভাবে করা প্রয়োজন।

মুজিবনগর শুধু ঐতিহাসিক স্থানই নয়, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং রাষ্ট্র গঠনের ভূমিও। যুদ্ধ করে বিজয়ী হওয়া প্রতিটি দেশের এমন একটা জায়গা থাকে, যেটি মানুষের আবেগের সঙ্গে যুক্ত। যেমন আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে চিহ্নিত। ঠিক সেভাবে মুজিবনগরে উপযুক্ত স্থাপনা তৈরি করা এবং বড় উৎসবের জায়গা হতে পারে।

মুজিবনগর জাদুঘর আরও সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন। মুক্তিযুদ্ধকালীন পুরোনো অস্ত্র সংগ্রহ করে সংরক্ষণসহ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক ধরনের পেইন্টিংও থাকতে পারে সেখানে। ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় সব ঘটনাকে জাদুঘরে তুলে ধরার ব্যবস্থা রাখা দরকার, যাতে এটি স্বাধীনতার জাদুঘর হিসেবে পূর্ণতা পায়। ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক নিদর্শন বিবেচনায় এটি হোক আন্তর্জাতিক মানের জাদুঘর। যাতে এখানে এসে মানুষ বুঝতে পারে মুজিবনগর হলো বাংলাদেশের উৎপত্তিস্থল। মুজিবনগর থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কথা কার্যত সারা বিশ্ব আনুষ্ঠানিকভাবে জানল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই গঠিত হয়েছিল মুজিবনগর সরকার। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ছিল স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের দিন। ভোরের দিকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও ওসমানী গাড়িতে কলকাতা থেকে মেহেরপুরের উদ্দেশে রওনা হন।

১৭ এপ্রিল শপথ অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের হাজির করার ভার ছিল আমার ও আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের তৎকালীন হুইপ আবদুল মান্নানের ওপর। ১৬ এপ্রিল আমরা দুজনে মিলে কলকাতা প্রেসক্লাবে যাই। এই প্রথম বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দুজন প্রতিনিধি বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হলেন। পুরো প্রেসক্লাব লোকে লোকারণ্য। সার্চলাইটের মতো অসংখ্য চোখ আমাদের দিকে নিবদ্ধ। ক্লাবের সেক্রেটারি উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সমবেত সাংবাদিকদের পরদিন ১৭ এপ্রিল কাকডাকা ভোরে প্রেসক্লাবে হাজির হতে অনুরোধ জানানো হলো। তাঁদের বলা হলো, আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের একটি বিশেষ বার্তা তখন জানানো হবে। তাঁদের কেউ কেউ আরও কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেন। আমরা কোনো উত্তর দিতে অপারগতা

প্রকাশ করলাম। সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের গাড়ি তৈরি থাকবে বলে জানালাম।

এদিকে শপথ অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি তৈরি করা হচ্ছে। জানা গেল প্রধান সেনাপতি ওসমানীর সামরিক পোশাক নেই। কিন্তু শপথ অনুষ্ঠানের জন্য তাঁর সামরিক পোশাক প্রয়োজন। বিএসএফকে ওসমানীর জন্য এক সেট সামরিক পোশাক দিতে বললাম। তাদের স্টকে ওসমানীর গায়ের মাপে কোনো পোশাক পাওয়া গেল না। সেই রাতে (১৬ এপ্রিল) কাপড় কিনে দরজি ডেকে তাঁর জন্য পোশাক তৈরি করা হলো।

মুজিবনগরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মার্চপাস্ট পরিদর্শন করছেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম

আর আমি ও আবদুল মান্নান ভোরের দিকে কর্মসূচি অনুযায়ী কলকাতা প্রেসক্লাবে গেলাম। সেই ভোরেও ক্লাবে লোকধারণের জায়গা নেই। ক্লাবের বাইরেও অনেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে বিনীতভাবে বললাম, আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আপনাদের জন্য একটা বার্তা নিয়ে এসেছি। তাঁদের জানালাম স্বাধীন বাংলার মাটিতে বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করবে। আপনারা সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত। এ সময় কেউ কেউ জানতে চাইলেন, কোথায় যাবেন, কীভাবে যাবেন? আমি আবার বললাম, 'আমরা আপনাদের সঙ্গে রয়েছি। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।' আমাদের গাড়িগুলো তখন প্রেসক্লাবের সামনে। উৎসাহী সাংবাদিকেরা গাড়িতে উঠলেন। অনেকের কাঁধে ক্যামেরা। ৫০-৬০টি গাড়ি নিয়ে আমরা রওনা দিলাম গন্তব্যস্থলের

দিকে। আমি ও আবদুল মান্নান দুজন দুই গাড়িতে। আমার গাড়িতে কয়েকজন বিদেশি সাংবাদিক ছিলেন। পথে তাঁদের সঙ্গে অনেক কথা হলো।

শপথ অনুষ্ঠানের নির্ধারিত স্থানে, অর্থাৎ বৃহত্তর কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে পৌঁছাতে বেলা ১১টা বেজে গেল। আমরা পৌঁছার পরপরই অনুষ্ঠান শুরু হয়। ঝিনাইদহ মহকুমার পুলিশ প্রধান মাহবুব উদ্দিন আহমদ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার দেন। মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক তৌফিক-ই-ইলাহী শপথ অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন। আগেই ঠিক করা হয়েছিল, আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের চিফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী শপথ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করবেন।

অনুষ্ঠানের জন্য ছোট্ট একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়। মঞ্চে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যরা, এম এ জি ওসমানী, আবদুল মান্নান ও আমি। আবদুল মান্নান অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন। ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিলেন। এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এই স্থানের নাম ‘মুজিবনগর’ নামকরণ করেন। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত মুজিবনগর ছিল সরকারের রাজধানী।

সাংবাদিকদের প্রধান প্রশ্ন ছিল সরকারের প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায়? জবাবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, 'আমরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই মন্ত্রিসভা গঠন করেছি। তাঁর সঙ্গে আমাদের চিন্তার (বিস্তর) যোগাযোগ রয়েছে।'

আমবাগানের অনুষ্ঠানে ভরদুপুরে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়। হাজারো কণ্ঠে তখন উচ্চারিত হচ্ছিল 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো' ইত্যাদি স্লোগান।

আমার কাজ ছিল দ্রুত অনুষ্ঠান শেষ করে সাংবাদিকদের কলকাতা ফেরত পাঠানো। দুপুরের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। সাংবাদিকদের গাড়িতে করে ফেরত পাঠানো হলো। মন্ত্রিসভার সদস্যরা ফিরলেন সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠানের পর কলকাতায় ফিরে গিয়ে সাংবাদিকেরা বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে সরকার গঠন সম্পর্কে সংবাদ পাঠাতে শুরু করলেন।

মুজিবনগর সরকার নিয়ে এমন একটা সময়ে আমরা আলোচনা করছি, যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে। বাংলাদেশের ইতিহাস জানতে হলে মুজিবনগর সরকার এবং এই সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে হবে, বুঝতে হবে। আমি মনে করি মুজিবনগর সরকারের ইতিহাস ও তাৎপর্য পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রও অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। মুজিবনগর সরকার নিয়ে গবেষণা হওয়া দরকার। বিশেষ করে শিক্ষার্থী এবং নতুন প্রজন্ম মুজিবনগর সরকার বিষয়ে আগ্রহ নিয়ে গবেষণা করবে, এটিই প্রত্যাশা।

স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা, এই সরকারের বিচক্ষণতা ও কৌশল সম্পর্কে বর্তমান সময়ের তরুণ রাজনীতিবিদদেরও জানা থাকা দরকার। যে ত্যাগ, সাহস ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীনতা অর্জনের পথে নিয়ে যায় মুজিবনগর সরকার, সেই গৌরবের ইতিহাস কখনো ভুলে যাওয়ার নয়। বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নিতে এবং রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত ওই সময়ের নেতাদের জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ মুজিবনগর সরকার গঠনের দিবস, দেশের নতুন প্রজন্ম ও ভবিষ্যতের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। আমরা আগামীতেও দিনটি যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করব।♦

ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম : জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, সাবেক সাংসদ ও প্রতিমন্ত্রী, বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রচয়িতা।

বাংলাদেশের প্রথম সরকারের সুবর্ণজয়ন্তী

র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী

১০ ও ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের ইতিহাসের খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুইটি দিন। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সনে গঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার এবং জারি করা হয়েছিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (The proclamation of Independence)। ১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করছিল শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে মুজিবনগরের (স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষিত প্রথম রাজধানী) আম্রকাননে। ১৯৭১ আমাদের মহান স্বাধীনতার যেমনি সুবর্ণজয়ন্তী, তেমনি আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণেরও এই বছর সুবর্ণজয়ন্তী। আমাদের স্বাধীনতার প্রথম সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান ও সর্বাধিনায়ক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এ বলা হয়েছে–

'বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করনার্থে, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা (বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন

এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখন্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ ৬ দ্রষ্টব্য) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম, এবং এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকবেন, (ঘোষণাপত্রের ৯ম অনুচ্ছেদাংশ) এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, এবং রাষ্ট্রপতি (এই ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু/ সৈয়দ নজরুল) প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন)।'

সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পূর্বে আমরা স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ বিজয়ের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলাম। ১০ ও ১৭ এপ্রিলের পূর্বে সারাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ অসংগঠিত ও অনেকটা বিশৃংখলভাবেই দখলদার পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের দেশীয় দোসরদের মোকাবেলা করে যাচ্ছিলো। মাত্র ১৫ দিনের মাথায় আমাদের জনপ্রতিনিধিগণ নিজেদেরকে সংগঠিত করেন একক দায়িত্বে। সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ একসংবদ্ধ ও সুগঠিত কাঠামোর রূপ লাভ করে। যা দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধ জয়ে সহায়তা করেছিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুধু সশস্ত্রতাই ছিলনা। নবগঠিত সরকারের অভ্যন্তরীণ বেসামরিক প্রশাসন, বৈদেশিক প্রচার-প্রচারণা, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, বিশ্ব রাষ্ট্রসমূহের সমর্থন আদায়, জাতিসংঘের অবিরাম প্রয়াস মুক্তিযুদ্ধকে ক্রমশ শক্তিশালী ও বিজয়কে

অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। বন্ধু রাষ্ট্র ভারত এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সক্রিয় ও ইতিবাচক সমর্থনে, মার্কিনী ও চৈনিক সক্রিয় বিরোধিতা সত্ত্বেও আমরা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ ঘটিয়ে বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করতে সক্ষম হই।

এই বিজয়ের পথ ধরেই জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা লাভ করে এবং পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ছাড়িয়ে আনতে সক্ষম হই। ১০ ও ১৭ এপ্রিলকে ঘিরে বাংলার মুক্তিসংগ্রামের যে ঘনঘটা তা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। এপ্রিলের এই সব ঘটনাবলিকে ইতিহাসের বাস্তবতার নিরীখে বিচার করতে হবে। মুজিবনগরের প্রথম বাংলাদেশ সরকার এবং তাজউদ্দিন-নজরুল-মনসুর আলী-কামরুজ্জামানের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি (খুনী) মোস্তাকের নেতিবাচক কর্মকান্ডকেও বিবেচনায় নিতে হবে। মোস্তাকের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র অথচ কূটচালে তৎপর গোষ্ঠিটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে বিপথগামী করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। ষড়যন্ত্রী মোস্তাকের ষড়যন্ত্রকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গুরুত্ব না দেওয়ায় শান্তিকামী ভাবাদর্শ আমাদের সমাজ কাঠামোয় বহাল তবিয়তে রয়ে যায়। এমনকি এদের একটি অংশ এখনও সর্বোতভাবে বাংলাদেশকে মেনে নিতে পারেনি। জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা প্রশ্নে তাদের অনীহা, ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক অবস্থানের বিপরীতে ওদের অবস্থানই মোস্তাকের ধারার ফল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও মুজিবাদর্শে দৃঢ় অবস্থানই স্বাধীনতা বিরোধী এই চক্রটিকে মোকাবেলা করতে সক্ষম। রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র বিরোধীদের অবাধ তৎপরতার সুযোগ হাজার বছরের শৃঙ্খল ভাঙ্গা স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য কখনও সুখকর হতে পারে না। এবং স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামোকে সুদৃঢ় ও মজবুত করতে পারবে না। রাষ্ট্র জন্মের পঞ্চাশ বছর অতিবাহনেও স্বাধীনতা বিরোধীদের অপতৎপরতাকে আদর্শিক ও রাষ্ট্রিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হলে আমাদের রাষ্ট্র দর্শনের ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে।

তাই আমরা মনে করি বাংলাদেশের প্রথম সরকারের সুবর্ণজয়ন্তীতে উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো নিয়ে ভাববার সময় খুবই জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকার বিষয়গুলো সিরিয়াসলি নিতে হবে।

আর দেরি নয়, এখনই সময়।♦

ভূমিপুত্র শেখ মুজিব

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

গত ১০ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুকে ভূমিপুত্র আখ্যায়িত করে যা বলেছেন, তার চেয়ে বড় বাস্তবতা আর কিছু হতে পারে না। বঙ্গবন্ধু যে ভূমিপুত্র, তা দুটি প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনায় আসে। প্রথমটি ঐতিহাসিক এবং দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক-সামাজিক। উভয় মানদণ্ডেই তিনি ছিলেন ভূমিপুত্র। অনেক ইতিহাস গবেষক পণ্ডিত ব্যক্তি এটা মানেন যে, বাংলাদেশ যে অঞ্চলের উপর প্রতিষ্ঠিত সে অঞ্চল, অর্থাৎ বঙ্গভূমি কখনো কোনো বাঙালির শাসনাধীন ছিল না। এই অমোঘ সত্য প্রকাশ করায় সত্য বিশ্বাসী ব্যক্তিদের একনিষ্ঠ প্রশংসা ও সাধুবাদ অর্জন করেছেন প্রধানমন্ত্রী, যিনি সত্যের একনিষ্ঠ সাধক।

নেত্রী যা বলেছেন, ইতিহাস তা প্রমাণ করে। একটি ঐতিহাসিক সত্য হলো এই যে, বঙ্গভূমি ধারাবাহিকভাবে একটানা দিল্লি সাম্রাজ্যের অংশ ছিল না, ব্রিটিশ আমল ছাড়া। ছিল না মৌর্য আমলে, গুপ্ত শাসনে, সুলতানি আমলে। সম্রাট আকবর থেকে আওরঙ্গজেবের শাসনামলে বাংলা দিল্লির মোগল সাম্রাজ্যের অংশ ছিল বটে, কিন্তু বিদ্রোহ লেগেই থাকত।

আলেকজান্ডারের আক্রমণের পূর্বে গোটা ভারত ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। বাংলাও ছিল বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত। গ্রিক-রোমানরা বঙ্গভূমিকে বলত গঙ্গারিদাই। অনেক সময় বঙ্গভূমি মগদের অধীন ছিল। আলেকজান্ডারের আক্রমণের পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নেতৃত্বে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও সমাপ্তির কিছু পরে গুপ্ত সম্রাটগণ বঙ্গভূমিসহ ভারতের বহুলাংশ শাসন করলেও গুপ্ত বংশের পতনের পর তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং সে সময় বাংলার গৌড় অঞ্চলের স্বাধীন অধিশ্বর হিসেবে উদিত হন রাজা শশাঙ্ক, ৫৯০ সালে। কিছু ঐতিহাসিকের মতে, শশাঙ্ক বাঙালি বংশোদ্ভূত হলেও বেশির ভাগ ঐতিহাসিক মনে করেন, শশাঙ্ক বাঙালি ছিলেন না। তখন ব্রহ্মী হরফ ছিল (দেব নাগরি তথা বাংলা হরফের পূর্বতন সংস্করণ)। তখনো চর্যাপদ শুরু হয়নি। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ দিলীপ কুমার গাঙ্গুলীর পরিষ্কার দাবি, শশাঙ্ক বাঙালি ছিলেন না। তারপর বাংলার সিংহাসনে বসেন যথাক্রমে পাল, সেন এবং ১৩৫২ সালে তুর্কি বংশীয় বাংলার শাহী শাসকগণ।

১২০০ সালে দিল্লির দাস বংশীয় সুলতান, তুর্কি রক্তের কুতুবউদ্দিন আইবেকের এক সেনানায়ক, ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি বাংলার সর্বশেষ সেনবংশীয় রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে সেন রাজত্বের ইতি ঘটান এবং বঙ্গভূমিতে নিজ রাজত্ব স্থাপন করেন। তার সময় বঙ্গভূমিতে দলে দলে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মীয় লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ১২০৬ সালে আলি মার্দান খিলজি নামক আর এক খিলজি জাতের তুর্কি বখতিয়ার খিলজিকে হত্যা করে। ১৩২৫ সালে দিল্লির তুগলগ বংশীয় সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলগ বাংলাকে তিন ভাগে ভাগ করেন। যথা– (১) সোনারগাঁও (২) গৌড় (৩) সাতগাঁও। কিন্তু দিল্লি শাসন বেশি সময় টেকেনি। ১৩৫২ সালে তুর্কি রক্তের শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ গোটা বাংলা একত্রিত করে তার স্বাধীন শাসক হয়ে বাংলায় শাহী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৫৯ সালে দিল্লির তুগলগ বংশীয় সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলগ বাংলার শাহীরাজদের দ্বিতীয়জন, শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহর কাছে পরাজিত হয়ে বাংলাকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকার করেন। ১৫২৬ সালে মোগল সম্রাট বাবর আফগান বংশোদ্ভূত সুলতান ইব্রাহিম লোধিকে পরাস্ত করে ভারতে মোগল রাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লিতে সুলতান রাজ্যের যবনিকাপাত ঘটে। এরপর বাবর বাংলার শাহী বংশের নাসিরুদ্দিন নুসরাত শাহকে পরাজিত করেন। বাংলায় মোগল আধিপত্য প্রসারিত হয় ধীরে ধীরে। সমসাময়িক গোটা বাংলা ছিল ১২টি আঞ্চলিক সামন্ত প্রধানের সমন্বয়ে একটি কনফেডারেশন। কিছু ঘটনা প্রবাহের পর তুর্কি-আফসার বংশীয় জনগোষ্ঠীর লোক আলিবর্দী খান মুর্শিদ কুলির উত্তরসূরিকে হত্যা করে নবাব হয়ে স্বাধীনভাবেই রাজ্য চালাচ্ছিলেন। তার মৃত্যুর

পর দৌহিদ্র সিরাজউদ্দৌলা নবাব হন। তিনিও অবাঙালি ছিলেন, ছিলেন তুর্কি আফসার গোষ্ঠীর, যার পিতার নাম ছিল মির্জা মোহাম্মদ হাশিম। নবাব সিরাজউদ্দৌলার মাতৃ ও ব্যবহারিক ভাষা ছিল ফার্সি। এরপর তো শুরু হয় ইংরেজ শাসন। ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসানের পর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের একটি প্রদেশ ছিল বিধায় তা স্বাধীন ছিল না। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন করে বঙ্গবন্ধুই হন বাংলার প্রথম বাঙালি শাসক বা ভূমিপুত্র শাসক। এ কথা সচরাচর যারা বলে থাকেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন '৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির, সহসভাপতি ইতিহাসের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসাবিজ্ঞানী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের যকৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মামুন মাহতাব স্বপ্নিল, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের প্রাক্তন পরিচালক, বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদের প্রধান অধ্যাপক উত্তম কুমার বড়ুয়া প্রমুখ। কিন্তু এখন বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার মুখ দিয়ে কথাটি উচ্চারিত হওয়ায় এটি সর্বোচ্চ পর্যায়ে উল্লিখিত হলো।

বঙ্গবন্ধু সব অর্থেই ছিলেন এদেশের সাধারণ মাটির মানুষের, অর্থাৎ ভূমিসন্তানদের নিকটতম ব্যক্তি। রাজনীতিতে আভিজাত্যবাদ ভেঙে তিনিই প্রথম সাধারণ মানুষের দরজায় রাজনীতি পৌঁছে দিয়েছিলেন। শেরেবাংলা ফজলুল হক এবং মওলানা ভাসানীও রাজনীতিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে আনার চেষ্টারত ছিলেন বৈকি, কিন্তু তারা সে উদ্দেশ্যে কোনো বিশাল শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। ব্রিটিশরাজের শেষ সময়ে বঙ্গীয় মুসলিম লিগে দুটি ধারা ছিল, একটি রক্ষণশীল, যা নিয়ন্ত্রণ করতেন বণিক, নবাব, জমিদারগণ; অন্যটি ছিল প্রগতিবাদীদের। বঙ্গবন্ধু ছিলেন প্রগতির ধারায়। ১৯৪৭ সালে বঙ্গবন্ধু ও হাশিম সাহেব মিলে একটি খসড়া মেনোফ্যাস্টো তৈরি করেছিলেন পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো স্থির করার জন্য। ১৯৪৯ সালে বঙ্গবন্ধুই খুলনার কৃষকদের দাওয়াল আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে গিয়েছিলেন। ভারত বিভাগের পূর্বে তিনি নবাব পরিবারের খাজা নাজিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সমর্থন করেছিলেন। আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িক ও সার্বজনীন রূপ দেওয়ার জন্য দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বর্জনের জন্য সাফল্যের সঙ্গে চাপ দিয়েছিলেন।

১৯৪৩ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের সময় তিনি তখনকার সময়ে বাংলার বেসামরিক সরবরাহমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে চাপ দিয়েছিলেন অন্যান্য এলাকা থেকে খাদ্য আমদানি এবং জরুরি ভিত্তিতে দ্রুততম সময়ে খাদ্য

উৎপাদনের জন্য। তিনি সে সময় উল্কার মতো সমগ্র বঙ্গভূমিতে বিচরণ করেছেন, সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন বুভুক্ষ মানুষের হাহাকার লাঘব করার, বিভিন্ন জায়গায় লঙ্গরখানা খুলে দিন-রাত পরিশ্রম করেছেন ভুখা মানুষের মুখে খাবার তোলার জন্য।

বঙ্গবন্ধুর চাপে সোহরাওয়ার্দী সাহেব রাতারাতি বিরাট সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট গড়ে তুললেন, 'কন্ট্রোল' দোকান খোলার বন্দোবস্ত করলেন, গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা করার হুকুম দিলেন। দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভয়াবহ অবস্থার কথা জানালেন এবং সাহায্য দিতে বললেন। চাল, আটা ও গম বজরায় করে আনাতে শুরু করলেন। ইংরেজের কথা হলো, বাংলার মানুষ যদি মরে তো মরুক, যুদ্ধের সাহায্য আগে। যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রথম স্থান পাবে। ট্রেনে অস্ত্র যাবে, তারপর যদি জায়গা থাকে তবে রিলিফের খাবার যাবে। যুদ্ধ করে ইংরেজ, আর না খেয়ে মরে বাঙালি; যে বঙালির কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলাদেশ দখল করে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়, তখন বাংলার এত সম্পদ ছিল যে, একজন মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী গোটা বিলাত শহর কিনতে পারত। সেই বাংলাদেশের এই দুরবস্থা চোখে দেখে স্থির থাকতে পারেননি বঙ্গবন্ধু। মা মরে পড়ে আছে, ছোট বাচ্চা সেই মরা মায়ের স্তন চাটছে। কুকুর ও মানুষ একসঙ্গে ডাস্টবিন থেকে কিছু খাওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি করছে। বাড়ির দুয়ারে এসে চীৎকার করছে, 'মা বাঁচাও, কিছু খেতে দাও, মরে তো গেলাম, আর পারি না, একটু ফেন দাও'। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, তিনি হোস্টেলে যা বাঁচে, দুপুরে ও রাতে বুভুক্ষুদের বসিয়ে ভাগ করে দিতেন। এই সময় শহীদ সাহেব লঙ্গরখানা খোলার হুকুম দিলেন। বঙ্গবন্ধুও লেখাপড়া ছেড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দিনভর কাজ করতেন, আর রাতে কোনো দিন বেকার হোস্টেলে ফিরে আসতেন, কোনো দিন লীগ অফিসের টেবিলে শুয়ে থাকতেন। তার সঙ্গে ছিলেন আরো কয়েক জন সহকর্মী। তিনি সাধারণ মানুষের বাংলা ভাষার দাবিতে সোচ্চার ছিলেন এবং সে কারণে জেলও খেটেছেন। জমিদার প্রথা বিলুপ্তির জন্য আইন প্রণয়নে তার দাবি ছিল অত্যন্ত সরব, যার ফলশ্রুতিতে জমিদারি উচ্ছেদ এবং প্রজাসত্ব আইন প্রণীত হয়। পঞ্চাশের দশকে তিনি আদমজির শ্রমিকদের আন্দোলনের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হয়ে তাদের সঙ্গে মিলে গিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ষড়যন্ত্র করে আদমজিতে পাঁচ শতাধিক লোককে হত্যা করলে বঙ্গবন্ধু আহার-নিদ্রা পরিহার করে, নিজের জীবন বাজি রেখে নেমে পড়েছিলেন আদমজির শ্রমিকদের রক্ষায়।

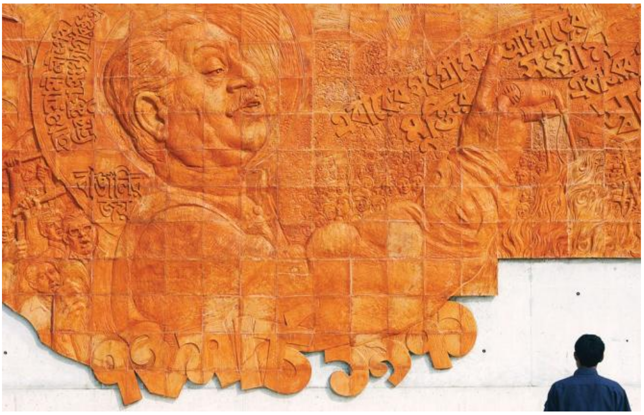

তিনি ১৯৬৯ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন হতভাগা ভুক্তভোগীদের সহায়তায়, সোচ্চার হয়েছিলেন তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার দাবিতে। তার সমস্ত জীবনের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল সাধারণ মানুষ, যে কারণে তিনি পেয়েছিলেন অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা, যা এই উপমহাদেশের অন্য কারো পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয়নি। এমনকি ইন্দিরা গান্ধী ৬ নভেম্বর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বলেছিলেন, শেখ মুজিব তার (ইন্দিরার) চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয়। তার গণমুখী ও গণহিতৈষী রাজনীতির কারণেই ১৯৭১-এর ৭ মার্চ তার জনসভায় নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এত লোক যোগ দিয়েছিলেন, যা ছিল অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গকারী। তার সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আর সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই তিনি বাকশাল সৃষ্টি করেছিলেন সংশ্লিষ্ট সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে। বাকশাল করার পেছনে তার ব্যক্তিগত বা দলীয় কোনো ফায়দা ছিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি বড় বড় শিল্প রাষ্ট্রীয়করণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, দেশের অর্থনীতিতে উচ্চবিত্তদের একচ্ছত্র আধিপত্য ভেঙে সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। একই উদ্দেশ্যে তিনি ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করেছিলেন এবং সরকারি খাসজমি ভূমিহীনদের ইজারা দেওয়ার নিয়ম প্রচলন করেছিলেন। সাধারণ জেলেরা যাতে মহাজনদের দ্বারা শোষিত হতে না পারে, তার জন্য 'জাল যার জলা তার' নীতির প্রবক্তা ছিলেন বঙ্গবন্ধু, যে নীতি অনুযায়ী সরকারি জলমহালের ইজারা জেলেদের দেওয়া হয়।

আজ যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গৃহহীন জনগণকে ঘর তৈরি করে দিচ্ছেন, সেই ইচ্ছা বঙ্গবন্ধু প্রথম ধারণ করেছিলেন। কিন্তু তার হত্যাকারীরা বঙ্গবন্ধুকে তা করতে দেয়নি, যার জন্য সেই দায়িত্ব এসে পড়েছে তার যোগ্য কন্যার ওপর। বঙ্গবন্ধু সব মানুষের মধ্যে গণশিক্ষা প্রচলনের জন্য ড. কুদরত-ই-খোদার নেতৃত্বে শিক্ষা

কমিশন গঠন করেই শান্ত হননি, কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করার উদ্যোগও নিয়েছিলেন। তিনি সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি হিসেবে যে কথাগুলো সন্নিবিষ্ট করেছেন, তার দ্বিতীয় শীর্ষস্থানেই রয়েছে শোষণমুক্তির কথা। আরো রয়েছে উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা, বণ্টন প্রণালিসমূহের জনগণভিত্তিক মালিকানা। মূলনীতিতে তিনি কৃষক-শ্রমিকের মুক্তির কথা বলেছেন, গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লবের কথা বলেছেন, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলেছেন, জনস্বাস্থ্যের কথা বলেছেন। দেশে-বিদেশে তার সমস্ত বক্তৃতায় প্রাধান্য পেত কৃষক-শ্রমিকদের কথা। ২৭ জানুয়ারি বিশ্বখ্যাত লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসে এক আলোচনা সভায় বিশ্বনন্দিত নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন বঙ্গবন্ধুকে 'বিশ্ববন্ধু' আখ্যায়িত করে বলেছেন, তার অসাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে ভারত ও বিশ্বকে অনেক কিছু শেখার আছে। অমর্ত্য সেন আরো বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসৃত হলে শ্রীলঙ্কায় রক্তপাত, গৃহযুদ্ধ হতো না। তিনি বলেছেন, বঙ্গবন্ধু যে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ ধারণ করতেন, তা বিশ্বকে বদলে দিয়েছে। একই সভায় অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেছেন, বঙ্গবন্ধু রেলগাড়িতে তৃতীয় শ্রেণিতে যাতায়াত করতেন কৃষকদের সাথে, যাদের তিনি বুঝতে পারতেন। অবশ্য ১৯৭৩ সালের মে মাসে বিশ্ব শান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে জুলিওকুরি শান্তি পদক প্রদানকালে তাকে বিশ্ববন্ধু বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। বিশ্বের ১৪০টি দেশের প্রতিনিধিগণ চিলির রাজধানীতে একত্রিত হয়ে বঙ্গবন্ধুকে জুলিওকুরি শান্তি পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। পদকপ্রাপ্তিকালে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ যে কোনো স্থানে হোক না কেন, তাদের সাথে আমি রয়েছি।'

অমর্ত্য সেনের দাবি যে কতখানি যৌক্তিক, তা বোঝা যায় সারা বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর চলমান জনপ্রিয়তা নিরীক্ষা করলে। সারা পৃথিবীর কাছে তার পরিচিতি বিশ্বের সব অঞ্চলের নির্যাতিত মানুষের মুখপাত্র হিসেবে। ইতিহাসে তিনি সেই পরিচয় নিয়েই চিরকাল বেঁচে থাকবেন, যার প্রমাণ ৪৫ বছর পরেও অমর্ত্য সেনের মতো একজন বিশিষ্ট নোবেল বিজয়ীর মুখে বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম প্রশংসা। বঙ্গবন্ধু যেভাবে মাটির মানুষের সঙ্গে মিলে গিয়েছিলেন, তাদের স্বার্থ রক্ষায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তার নজির কখনো ছিল না। তাই তো ভূমিপুত্র কথাটি বঙ্গবন্ধুর বেলায়ই প্রযোজ্য, শুধু ঐতিহাসিক অর্থেই নয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক, তাত্ত্বিক এবং সামাজিক অর্থেও।♦

লেখক : আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

শতবর্ষে বঙ্গবন্ধুর যত অলংকার

ইমাম মেহেদী

২০২০ সাল মুজিববর্ষ হিসেবে পালিত হচ্ছে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। কারণ ১৯২০ সালে টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির পুরুষোত্তম ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান। কালের বিবর্তনে শতবর্ষে আজও বঙ্গবন্ধু আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এবং প্রাসঙ্গিক।

হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালির অধিকার আদায়, মুক্তির আন্দোলন, ভাষা ও স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন বহু প্রতিথযশা রাজনৈতিক নেতা এবং বিপ্লবী। কিন্তু স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিকাশ ও বিজয়ের স্বাদ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অভিন্ন দুটি শব্দ। যে শব্দ দুটি বাঙালির নিজস্ব স্বকীয়তার স্থাপত্যর নিদর্শন। একই বিনি সুতোয় গাঁথা। যে শব্দ দুটি বিশ্বমানচিত্রে বাঙালির প্রতিনিধিত্ব করে একটি স্বাধীনতার পতাকার মাধ্যমে।

মেধা, মনন, প্রজ্ঞা, ভালোবাসার অদম্য সমাহার নিয়ে হাজার বছরের বাঙালি ও বাংলার ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে উঠেছেন অবিসংবাদিত নেতা। যুগে যুগে আমরা বঙ্গবন্ধুকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে ধারণ ও স্মরণ করে আসছি। যা বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম। আমাদের এই বাংলা ভূখন্ড যুগে যুগে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী দ্বারা শাষিত ও শোষিত হয়েছে। আর বঙ্গবন্ধু ছিলেন সেই শোষিত মানুষের নেতা। বঙ্গবন্ধু ধর্মগতভাবে হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান ছিলেন

না। ছিলেন মুসলমান। তার চেয়ে তিনি বেশি ছিলেন খাঁটি বাঙালি। বঙ্গবন্ধুর চিন্তা চেতনা ছিলো অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠন। যেখানে বহুধর্মের মানুষ একসঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করবে। সেই বাংলাদেশের জন্যই তিনি আজীবন রাজনীতি করেছেন এবং স্বপ্ন দেখেছে যে রাজনীতির হাতেখড়ি নিয়েছেন তিনি কিশোর বয়স থেকেই।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হওয়ার পরও আমরা স্বাধীন হতে পারিনি। পরবর্তীতে 'ইস্টবেঙ্গল' এর পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তান আমাদেরকে চাপিয়ে দিয়ে ' ইস্ট পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তান' নামকরণ করেছে।

১৯৬৯ সালে ৫ ডিসেম্বর গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীর ৬ষ্ঠ মৃত্যুবাষির্কীতে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে আমাদের এই মানচিত্রকে প্রথমবারের মত নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। তার আগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত হয়েছে আমাদের এই অঞ্চল। কখনো বা আবার আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বঙ্গ, বঙ্গদেশ, বাংলা, পূর্ববাংলা, ইস্ট বেঙ্গলসহ অনেক নামেই নামকরণ হয়েছে।

কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সেই 'বাংলাদেশ' একাত্তর সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের মধ্যে দিয়ে বিশ্বের মাঝে হাজার বছরের মানচিত্রে ঠাঁই করে নিয়েছে। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর যখন প্রথম সংবিধানে প্রণীত ও গৃহীত হয় সেই সময় সাংবিধানিকভাবে নাম দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত 'বাংলাদেশ'। সুতরাং বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থক। বাংলাদেশকে চিনতে হলে বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। এবারে আসি বঙ্গবন্ধুকে আমরা কতভাবে ধারণ ও স্মরণ করি তা নিয়ে কিঞ্চিত আলোচনায়।

১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন তৎকালীন ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ। সেই থেকে তিনি আমাদের 'বঙ্গবন্ধু'। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ তৎকালীন ডাকসু ছাত্রনেতা আ.স.ম. আব্দুর রব বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির জনক' উপাধিতে ভূষিত করার মধ্য দিয়ে হাজার বছরের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠলেন 'জাতির জনক'। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানেও শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জাতির জনক' হিসেবে ঘোষণা করে।

১৯৭১ সালের সাত মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসকি ভাষণ এখন বিশ্বের সেরা ভাষণের একটি। যে ভাষণ বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করেছিল স্বাধীনতার জন্য। সেই ভাষণ এখনও বিশ্ব ঐতিহ্যের সম্পদ। ইতিহাস ঐতিহ্যবাহী ভাষণের প্রসঙ্গ আসলেই বঙ্গবন্ধুর নাম চলে আসে।

অন্যদিকে একাত্তর সালের ৫ এপ্রিল ব্রিটিশ ম্যাগাজিন 'নিউজ উইক' এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' হিসেবে অখ্যায়িত করেন

সাংবাদিক লোরেন জেঙ্কিস। সেই থেকে তিনি বিশ্বের মাঝে 'রাজনীতির কবি' হিসেবে পরিচিত।

একাত্তর সালের ১৭ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের ভবেরপড়া গ্রামের বৈদনাথ তলার নামকরণ করেন মুজিবনগর। সেই থেকে মুজিবনগর। এমনকি 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' খাতাকলমে থাকলেও তার সাথে হাজার বছরের ইতিহাসে সেই সরকার হয়ে গেলো মুজিবনগর সরকার। পরবর্তীতে মুজিবনগর উপজেলায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং সেখানে মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজসহ বঙ্গবন্ধু, জাতীয় চারনেতা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত নান্দনিক নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা এখন বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাত মার্চের ভাষণ তাঁর আদলে দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং শেখানো ও শোনানো হয়। যার মাধ্যমে একটি জাতির নতুন প্রজন্মের কাছে ইতিহাসের প্রকৃত বার্তার চিত্র ফুটে ওঠে। যুগ যুগ ধরে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে দেশে বিদেশে গান, কবিতা, সিনেমা, ডকুমেন্টরিও রচিত হয়েছে। যেগুলো বাঙালি হৃদয়ে ধারণ করে আসছে বহুবছর ধরে। এমনকি বাঙালি 'মুজিব কোট' এর মত পোশাকের মাধ্যমেও বঙ্গবন্ধুকে ধারণ করে আসছে যুগ যুগ ধরে। দেশ বিদেশে বহু ধরনের কোর্ট পাওয়া যায় কিন্তু তার মধ্যে 'মুজিব কোট' অন্যতম চেতনা বহন করে। যার সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাস মিশ্রিত। শেখ মুজিব তার রাজনৈতিক প্রচারণায় যে কোটটি পরতেন তাকে বাংলাদেশে 'মুজিব কোট' নামে ডাকা হয়।

তাছাড়াও মিয়া ভাই, মুজিব ভাই, শেখ সাহেব এই শব্দগুলিও আজ বিশেষভাবে সংরক্ষিত হয়েছে মর্যাদার সহিত শুধু বঙ্গবন্ধুর জন্য। বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে অনেকই মুজিব ভাই, শেখ সাহেব কিংবা মিয়া ভাই ডাকতেন। এছাড়াও 'আমার বাঙালি, বাংলার মানুষ, মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা ইত্যাদি শব্দগুলোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন বঙ্গবন্ধু এককভাবে।

অন্যদিকে ১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাম) চতুর্থ সম্মেলনে কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো। সেই সময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর সাক্ষাৎ হলে তিনি বঙ্গবন্ধুকে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন, 'আই হ্যাভ নট সিন দ্য হিমালয়েজ। বাট আই হ্যাভ

সিন শেখ মুজিব। ইন পারসোনালিটি অ্যান্ড ইন কারেজ, দিস ম্যান ইজ দ্য হিমালয়েজ। আই হ্যাভ দাজ হ্যাড দ্য এক্সপিরিয়েন্স অব উইটনেসিং দ্য হিমালয়েজ।' অর্থাৎ, 'আমি হিমালয় দেখিনি। তবে শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসে এই মানুষটি হিমালয়ের সমান। এভাবে আমি হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতাই লাভ করলাম।' সেই থেকে বঙ্গবন্ধু হিমালয় নামেও পরিচিতি পেলেন।

২০০৩ সালে ফ্রন্টলাইন সাময়িকীর একটি প্রবন্ধে লেখক ডেভিড লুডেন তাকে একজন 'ফরগটেন হিরো' বা 'বিস্মৃত বীর' বলে উল্লেখ করেন। ১৪ এপ্রিল ২০০৪ সালে বিবিসি বাংলা সার্ভিসের শ্রোতা জরিপে বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে ঘোষণা করেন। বিবিসির পক্ষ থেকে ২০ জনের তালিকা প্রকাশ করা হয়। তারমধ্যে একনম্বর তালিকায় বঙ্গবন্ধু।

২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর, ইউনেস্কো শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এর মাধ্যমে বিশ্বের ইতিহাসে নতুনভাবে চেনা জানার সুযোগ হল বঙ্গবন্ধুকে। ২০১৭ সালে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির একটি সড়কের নাম 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মার্গ' নামকরণ করা হয়। তার আগেও কলকাতাতে একটি সড়কের নামকরণ রয়েছে বঙ্গবন্ধুর নামে।

অন্যদিকে ২০১৯ সালের ১৬ আগস্ট জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকে 'বিশ্ব বন্ধু' (ফ্রেন্ড অব দ্যা ওয়ার্ল্ড) হিসেবে আখ্যা দেয়। সেই থেকে বঙ্গবন্ধু 'বিশ্ববন্ধু' নামেও মানুষের মাঝে ছড়িয়ে গেলেন।

বাঙালির ইতিহাস হাজার বছরের ইতিহাস ঐতিহ্যমন্ডিত। বঙ্গবন্ধু যুগে যুগে তাঁর সৃষ্টি-কৃষ্টি দিয়ে হয়ে উঠেছেন বাংলার মানুষের কাছে হাজার বছরের পুরুষোত্তম। বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি তিনি ছড়িয়ে গেছেন এবং আছেন বিশ্বের বহুকোটি মানুষের হৃদয়ে বহুমাত্রিকভাবে। যে বহুমাত্রায় আমরা তাঁকে স্মরণ করে যাবো মন ও মননে আগামী হাজার বছর ধরে ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথের সেই ১৪০০ সালের কবিতার ভাষায়- আজি হতে শতবর্ষ পরে/ কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি/ কৌতূহলভরে/ আজি হতে শতবর্ষ পরে।♦

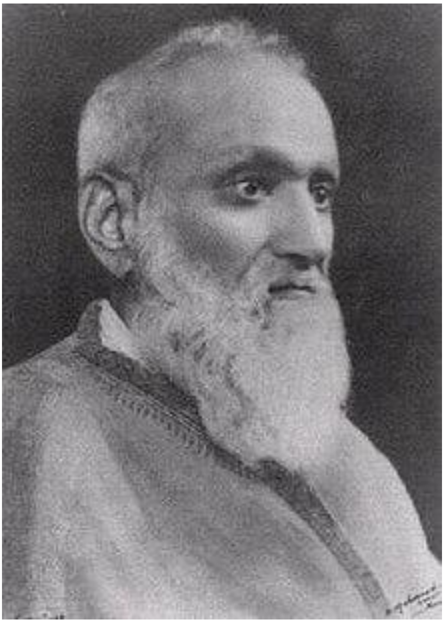

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র)

রেশমি রুমাল আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার

হাফেয মাওলানা খন্দকার ফখরুদ্দীন হোসাইনী

১৮৫৭ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে যখন গণবিদ্রোহ দেখা দেয় তখন ড. উইলিয়াম লিওর যে রিপোর্ট প্রদান করেছিলেন তার মূল কথা ছিল যে, 'এ বিদ্রোহকে নির্মূল করতে হলে মুসলমানদের জিহাদী চেতনাকে বিলুপ্ত করতে হবে; আর সে চেতনার মূলমন্ত্র আল-কুরআন ও তার বাহক ওলামা সমাজকে নির্মূল করে ফেলতে হবে।' সে সময় প্রায় অর্ধলক্ষের চেয়ে বেশী আলেম-ওলামাকে ফাঁসি দিয়ে শহীদ করা হয়। আন্দামান, মালটা, সাইপ্রাস, কালাপানিতে দ্বীপান্তর করা হয় হাজার হাজার আলেম-ওলামাকে। তাই পরবর্তীতে

নেতৃত্বের জন্য নতুন লোক তৈরির পরিকল্পনার ভিত্তিতেই দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠ করা হয়। সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-জাগরণ ও চেতনা ছড়ানোর প্রয়াস শুরু হয় একাডেমিক পন্থায়। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পাশাপাশি চলে আযাদীর দীক্ষা। ফলে ১৮৫৭ সালের পর থেকে নিয়ে ১৯০৯ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫২ বৎসরকাল আলেম-ওলামাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক ভয়াল নৈঃশব্দের অবস্থা বিরাজিত থাকে। যেই বিরাজমান শূন্যতা দূর করার লক্ষ্যে এবং 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত' ক্বায়েমের উদ্দেশে উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরামের ইসলামী রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণের শুভযাত্রার পথিকৃৎ ছিলেন শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র)। আর তাঁর রাজনৈতিক মেরুকরণের এই কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথের একনিষ্ঠ সঙ্গী ও অন্যতম সিপাহসালার ছিলেন তাঁর নও মুসলিম শিষ্য, প্রাণ উৎসর্গকারী-সাহসী ও স্বাধীনচেতা আলিম মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী র.।

জন্ম, ইসলাম গ্রহণ ও শিক্ষা-দীক্ষা

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র) এর ভাষ্যমতে তিনি শিয়ালকোট জেলার অন্তর্গত চিয়ানওয়ালী গ্রামে ১২ মুহাররম ১২৮৯হি. মোতাবেক ১০ মার্চ ১৮৭২ইং শুক্রবার ভোররাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি ৬ বছর বয়সে নানার মৃত্যুর পর জামপুরে অবস্থানরত আমার দুই মামার কাছে চলে আসি। এবং ১৮৭৮ইং সনে স্থানীয় একটি উর্দূ হাইস্কুলে আমার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ১৮৮৪ইং সনে আমি স্কুলের আরিয়া সমাজের এক ছেলের কাছ থেকে "তোহফাতুল হিন্দ" নামক গ্রন্থটি পেয়ে তা পাঠ করতে শুরু করলাম। গ্রন্থটি যতটুকু পাঠ করছিলাম সে অনুপাতে ইসলামের সততার ব্যাপারে আমার ইয়াক্বীন ও বিশ্বাস আরো বেশী বদ্ধমূল হচ্ছিল, এমনি মুহূর্তে পার্শ্ববর্তী প্রাইমারি স্কুল পড়ুয়া কয়েকজন হিন্দু বন্ধুর দেখা মিলল, যাদের মাধ্যমে আমি মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (র) রচিত 'তাকবিয়াতুল ঈমান' গ্রন্থটি পেয়ে পড়া শুরু করে দিলাম। এই কিতাবটি পাঠে তাওহীদ ও পৌরাণিক শিরকের অসারতা আমার হৃদয়ে খুব রেখাপাত করল।

কিছুদিন পর মৌলভী মুহাম্মদ লক্ষ্ণৌবী রচিত 'আহওয়ালুল আখিরাত' কিতাবটি পাঞ্জাবের অধিবাসী একজন আলিমের কাছে পেয়ে তাও পাঠ করলাম। তিনি আরো লিখেন যে, 'আহওয়ালুল আখিরাত' বারবার পাঠ এবং 'তোহফাতুল হিন্দ' গ্রন্থে নওমুসলিমদের জীবনী পাঠ আমার জীবনকে দ্রুত পাল্টে দিল, যে কারণে আমি আর ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করিনি। এবং পাঞ্জাবের অধিবাসী আলিমের কাছে নামাযও শিখে নিলাম। সাথে সাথে 'তোহফাতুল+ হিন্দ' এর রচয়িতা ওবায়দুল্লাহ এর নাম অনুসারে আমার নামটাও ওবায়দুল্লাহ রেখে দিলাম।

তারপর আমি সেই বছরই আগস্ট মাসের ১৫ তারিখ মাওলা পাকে উপর ভরসা করে দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে কোটলা অঞ্চলের একান্ত বন্ধু আব্দুল কাদেরকে সাথে নিয়ে জনৈক মাদরাসা ছাত্রের সাথে মুজাফফর নগর জেলার অন্তর্গত কোটলা রহমশাহ অঞ্চলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলাম। সেখান থেকে আবার সিন্ধ চলে গেলাম এবং পথিমধ্যে ঐ মাদরাসা ছাত্রের কাছেই আরবী ছরফের কিতাবগুলো পড়া শুরু করে দিলাম।

বাঁ থেকে–ড. নুর মোহাম্মদ সিন্ধি, মওলানা ওবায়দুল্লাহ, জামাল পাশা, মওলানা বরকতউল্লাহ ও বদরী বাই

মাওলা পাকের বিশেষ অনুগ্রহের উন্মেষে প্রাথমিক জীবনে ইসলাম অনুধাবন যেমন আমার জন্য সহজ হয়েছিল তদ্রুপ আমার জন্য সিন্ধে অবস্থানরত তৎকালীন সময়ের জুনাইদ সায়্যিদুল আরিফীন খ্যাত হযরত হাফেয মুহাম্মদ সিদ্দীক বড়চোন্ডির খিদমতে হাজির হওয়াও সহজসাধ্য হয়ে গেল। সেখানে আমি তাঁর সাহচর্যে কয়েক মাস কাটালাম এবং তাঁকে আমার ধর্মীয় পিতা মেনে নিলাম। পাশাপাশি সিন্ধকে আমি স্থায়ী নিবাসরূপেও বরণ করে নেয়ার পর হযরতের নিকট ক্বাদেরী রাশেদী তরীকায় বায়আত গ্রহণ করলাম। একদা আমার এই বলে দুআ করলেন যে, আল্লাহ তাআলা উবায়দুল্লাহকে কোন বিজ্ঞ আলিমের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা-দীক্ষা লাভের সুযোগ করে দিক।

মাওলানা সিন্ধী (র) বলেন যে, আল্লাহ মনে হয় আমার এই রূহানী পিতার সেই দুআ কবুল করেছেন, যে কারণে ইলম শিখার অদম্য স্পৃহা এক পর্যায়ে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র)-এর সংশ্রব গ্রহণের সুযোগ করে দেয়।

উল্লেখ্য যে, সিন্ধ ও বরচোন্ডিতে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি ১৩০৬ হিজরীতে 'দারুল উলূম দেওবন্দ' এ ভর্তি হন এবং মোটামুটি পাঁচ মাসের মধ্যে কুত্বী সহ মানতেক শাস্ত্রের যাবতীয় কিতাবাদি কয়েকজন আসাতিযার নিকট সমাপ্ত করে 'শরহে জামী' কিতাবটি মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ হাসান সাহেবের কাছে শেষ করেন। অপরদিকে একজন বিজ্ঞ ওস্তাযের অনুগ্রহে মুতালাআ করার পন্থা জেনে নেয়ার পর মেহনত মুজাহাদার মাধ্যমে তাঁর ইলমী তরক্কীর দুয়ার খুলে যায়। সর্বোপরি হিকমত ও মানতেক এর কিতাবগুলোর পাঠ দ্রুত শেষ করার জন্য কয়েক মাসের জন্য মাওলানা আহমাদ হাসান কানপুরির মাদরাসায় চলে যান। সেখান থেকে কয়েক মাসের জন্য রামপুর আলিয়া মাদ্‌রাসায় মাওলানা নাজিরউদ্দীন সাহেবের কাছে গমন করে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাব অধ্যয়ন শেষে ১৩০৭ হিজরির সফর মাসে পুনরায় দারুল উলূম দেওবন্দ এ ফিরে আসেন। এখানে দুই তিন মাস পর্যন্ত মাও. হাফেয আহমাদ সাহেবের নিকট পড়াশুনা করার পর শায়খুল হিন্দ মাও. মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র) এর দরসে বসার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং ১৩০৭ হিজরিতে হিদায়াহ, তালবীহ মুতাওয়াল, শরহু আকাইদ ও মুসাল্লামুস্‌ছুবূত এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ কিতাব সমূহের পরীক্ষা দিয়ে ষ্টারমার্ক নাম্বার অর্জন করেন। মাওলানা সিন্ধী (র) লিখেন যে, আমার উত্তরপত্র দেখে আমার দেওবন্দের প্রথম ওস্তায মাওলানা সায়্যিদ আহমাদ দেহলভী সাহেব মন্তব্য করে বললেন: 'এই তালিবে ইলম যদি সবধরনের কিতাবাদি পড়ার সুযোগ পায় তাহলে সে একদিন দ্বিতীয় শাহ আ. আযীয (র) হিসেবে গড়ে উঠবে।'

তিনি বলেন ১৩০৭ হিজরী সনে আমি 'তাফসীরে বায়যাবী' অধ্যয়ন শেষে দাওরায়ে হাদীস শ্রেণীতে অধ্যয়ন শুরু করি এবং 'সুনানে তিরমিযী' শায়খুল হিন্দ (র)-এর কাছে অধ্যয়ন করে সুনানু আবি দাউদ অধ্যয়ন করার জন্য কুতবুল ইরশাদ মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী (র)-এর কাছে গাঙ্গুহ চলে যাই।

হাদীসের অন্যান্য কিতাবগুলো মৌলভী আব্দুল করীম পাঞ্জাবী দেওবন্দী (র) এর নিকট খুব দ্রুত অধ্যয়ন করি। আমার মনে পড়ে সুনানু নাসাঈ ও সুনানু ইবনে মাজাহ চার চার দিনে শেষ করেছি এবং আস্‌সিরাজী ফিল মীরাছ দুই ঘন্টায় খতম করেছি। তিনি বলেন,আমি ক্বাদেরিয়া নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়ার ওজীফা রুহানী পিতা সায়্যিদুল আরিফীন হাফেয মুহাম্মদ সিদ্দীক বড়চোন্ডি (র)-এর প্রথম সারির খলীফা মাওলানা আবুস্‌সিরাজ দীনপুরির কাছে শিখতে থাকি। -বীস বড়ে মুসলমান

কর্ম জীবন ছেড়ে রাজনৈতিক জীবনে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র)

১৩২৭ হি. মোতাবেক ১৯০৯ সালে শায়খুল হিন্দ (র) তাঁর একনিষ্ঠ নও মুসলিম শিষ্য, প্রাণ উৎসর্গকারী-সাহসী ও স্বাধীনচেতা আলিম মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে দেওবন্দে ডেকে এনে দারুল উলূমের ফারেগ ছাত্রদের সমন্বয়ে 'জমিয়তুল আনসার' নামক এক সংগঠন গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। প্রিয় শিক্ষকের নির্দেশে সিন্ধি তাঁর ১৮/১৯ বৎসরের (১৮৯১ ইং ১৯০৯ইং) শিক্ষকতা, জ্ঞান চর্চা ও আধ্যাত্মিক সাধনার জীবন ছেড়ে দিয়ে জমিয়তুল আনসারের সেক্রেটারীরূপে সংগঠন ও আন্দোলনমুখর এক নতুন জীবনে প্রবেশ করেন। বাহ্যত এ সংগঠনের উদ্দেশ্য এই ছিল বলে ব্যক্ত করা হত যে, দারুল উলূমের প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠিত করা এবং আলীগড় ও দারুল উলূমের শিক্ষক-ছাত্রদের মাঝে হৃদ্যতার সম্পর্ক সৃষ্টি করা। কিন্তু এ সংগঠনের একটি অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। মূলত মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র)-এর একটি সুদূর প্রসারী কর্মসূচী ছিল দেওবন্দ মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্রদেরকে নিয়ে একটি মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তোলা এবং ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। অবশ্য তিনি তাঁর ছাত্রদের মনমানসিকতাকে এ চেতনার আলোকেই গড়ে তুলেছিলেন। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র) বলেন যে, এই আন্দোলনের গোড়াপত্তনকালে আমি, মাওলানা সাদেক সিন্ধী, মাওলানা আবূ মোহাম্মদ লাহোরী এবং স্নেহাস্পদ মৌলভী আহমদ আলী একসাথে কাজ করেছি।- বীস বড়ে মুসলমান পৃ.৪০৬

জমিয়াতুল আনসারের দায়িত্বে সিন্ধী (র) দীর্ঘ ৪ বৎসর (১৯০৯-১৯১৩) নিয়োজিত থাকেন। এ সময় তিনি প্রকাশ্য রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। ফলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের সাথে তাঁর মতানৈক্য দেখা দেয়, সুতরাং তিনি দেওবন্দ ছেড়ে দিল্লীতে চলে যান এবং মাওলানা মাহমূদ হাসান (র)-এর আন্দোলনের সুদূর প্রসারী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে তাঁরই নির্দেশে দিল্লীর ফতেহপুর মসজিদে ১৯১৩ সালে 'নাযযারাতুল মা'আরিফিল কুরআনিয়া' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে কুরআনের প্রশিক্ষণ দান ও কুরআনের জীবনাদর্শের সাথে পরিচিত করে তোলা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে তাদের অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে যে ভুল ধারণা গড়ে উঠেছিল তা দূর করে তাদেরকে আন্দোলনের পক্ষে সহযোগী শক্তি হিসাবে কাজে লাগানো।

সেমতে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র) আনিস আহমদ বি এ, খাজা আব্দুল হাই ও কাজী জিয়াউদ্দীন বি এ, প্রমুখদের ন্যায় তৎকালীন উল্লেখযোগ্য ইংরেজী

শিক্ষিতদেরকেও উক্ত মাদ্রাসায় ভর্তি করেন এবং ইসলামী রাজনীতির দীক্ষাদানে গৌরবান্বিত করেন।-তাহরীকে শায়খুল হিন্দ পৃ. ১৯২

এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র)-এর অন্যান্য সহযোগী ছিলেন হাকীম আজমল খান, নবাব বিকারুল মুলকসহ আরো অনেকেই।

মওলানা ওবায়দুল্লাহর সঙ্গে তেজাসিং আজাদ

এ সময় মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র) মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে দিল্লীর যুবশক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ফলে ডক্টর আনসারীর সাথে এবং পরবর্তীতে তাঁর মাধ্যমে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও মাওলানা মুহাম্মদ আলীর সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। এভাবে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র) উচ্চ পর্যায়ের ভারতীয় রাজনীতিবিদদের সাথে পরিচিত হয়ে উঠেন এবং সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। তাহরীকে শায়খুল হিন্দ পৃ.৬২

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র)-এর পরামর্শে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (র) ১৯১৫ সনের আগষ্ট মাসে ‘নাযযারাতুল মাআরিফিল কুরআনিয়া’-এর আদলে কলকাতায়ও ‘দারুল ইরশাদ’ নামে আরেকটি বয়স্ক কুরআন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে

তোলেন। যেখানে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ নিজেই কুরআনী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। তাহরীকে শায়খুল হিন্দ পৃ. ২০০

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে (১৯১৪ ইং) শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'আজাদ হিন্দ মিশন' নামক বিপ্লবী দলের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির একটি মিটিং দেওবন্দে তাঁর বাসভবনেই অনুষ্ঠিত হয়। এ মিটিংয়ে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ১৯১৭ ইং সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব পরিকল্পিত গণঅভ্যুত্থান ঘটানো হবে। কমিটি এ মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে তা শায়খুল হিন্দ (র)-এর নিকট হস্তান্তর করে এবং ইতিপূর্বে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র) তুর্কী ও আফগান সরকারদ্বয়ের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন, মুখোমুখি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা চূড়ান্ত করার দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পিত হয়।

ইতিমধ্যেই দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন সূচীত হয়। বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্যোগে উপমহাদেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানে স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামের জোর তৎপরতা শুরু হয়। এতে ইংরেজ সরকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং ভারতের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ও দলের কর্মীদেরকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। তারা একে একে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মাওলানা শওকত আলী প্রমূখ ব্যক্তিবর্গকেও গ্রেফতার করতে আরম্ভ করে। এ সময় মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র)ও এই ধরপাকড়ের আওতায় পড়বেন এই অনুমান করে শায়খূল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র) মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে, তুমি কাবুলের পথ ধর আর আমি হিজাযের পথে রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি। দু'জনেই দু'টি বৃহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশে ১৯১৫ সালে দু'দেশের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান।

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র)-এর উদ্দেশ্যে ছিল হিজাযের পথে তুরস্কে পৌঁছা এবং তুরস্ক কর্তৃক ভারত আক্রমণের চুক্তিকে চূড়ান্ত করা। আর মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে কাবুলে প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল কাবুল সরকারকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করা। তাছাড়া আফগানিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শায়খুল হিন্দ (র)-এর ছাত্র ও ভক্তদেরকে সংগঠিত করে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করা। আফগানিরা ছিল স্বাধীনচেতা, যুদ্ধপ্রিয় জাতি। কিন্তু উপজাতীয় অঞ্চলসমূহ ছিল বিচ্ছিন্নতার শিকার। বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে এদেরকে সংগঠিত করতে পারলে ইংরেজ বিতাড়নে একটি বলিষ্ঠ শক্তি হিসাবে তাদেরকে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা ছিল প্রচুর।

এতদুভয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র) তাঁর স্বাধীনচেতা অন্যতম সিপাহসালার ও একনিষ্ঠ শিষ্য মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীকেই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করেছিলেন।- দেওবন্দ আন্দোলন : ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান-২০১-২০২

কাবুলের পথে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি (র)

উস্তাযের নির্দেশানুসারে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র) আব্দুল্লাহ, ফাতেহ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ আলী এই তিন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে বিনা পাসপোর্টে বেলুচিস্তান ও ইয়াগিস্তান হয়ে কাবুলের পথে যাত্রা করেন। ১৯১৫ সালের ১৫ আগস্ট তিনি আফগান সীমান্তে পৌঁছেন। পরে মাওলানা মনসুর আনসারী উরফে মুহাম্মদ মিয়াকেও কাবুলে প্রেরণ করা হয়। এ সময় স্বাধীনতাকামী বহু ভারতীয় ব্যক্তিকে তিনি কাবুলে অবস্থানরত দেখতে পান। কাবুলে পৌঁছে তিনি আফগান বাদশাহ হাবীবুল্লাহ খান, মুঈনুস্ সুলতানাত এনায়েত উল্লাহ খান ও নায়েবুস্ সালতানাত সর্দার নাসরুল্লাহ খানের সাথে দেখা করেন।

বাদশাহ মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র)-এর কথাবার্তা ও বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ভারত স্বাধীনতার পক্ষে সেখানে কাজ করে যাওয়ার অনুমতি দেন এবং তাঁকে তুর্কী জার্মান মিশনের সাথেও যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে একযোগে কাজ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

তুর্কী-জার্মান মিশনের প্রতিনিধি রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও বরকতুল্লার সাথে পরিচিত হওয়ার পর মাওলানা সিন্ধী (র) কাবুলে একটি 'অস্থায়ী ভারত সরকার' গঠন করার সিদ্ধান্তে উপনীত হন। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্ট, বরকতুল্লাহকে প্রধানমন্ত্রী ও মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র)-কে ভারতমন্ত্রী তথা প্রতিরক্ষামন্ত্রী করে এই অস্থায়ী সরকারের অবকাঠামো ঘোষণা করা হয়। কিন্তু মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র) তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রেখে অচিরেই অস্থায়ী সরকারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করেন।

এই অস্থায়ী সরকারে কতিপয় তুর্কী ও জার্মানীও ছিল। কিছুকালের মাঝেই জার্মান সদস্যদের সাথে মিশনের কর্মসূচীর ব্যাপারে ভারতীয়দের মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। এই মতানৈক্য নিরসনের জন্য মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র) আফগান সরকারের উপস্থিতিতে মিশনের জন্য অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও যুক্তিযুক্ত একটি কর্মসুচী পেশ করে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তাছাড়া এই অস্থায়ী সরকারে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক গুরুত্ব কতটুকু থাকবে এ নিয়ে মিশনের হিন্দু-মুসলমান সদস্যদের মাঝে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিলে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ হিন্দুদের

সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে হিন্দুদেরকে প্রাধান্য দেওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং তারাই মিশনের প্রতিনিধিত্ব করবে বলে রায় দেন। স্বাধীনচেতা সিপাহসালার মাওলানা সিন্ধী (র) এসময়ও মহেন্দ্র প্রতাপের সাথে একটি গ্রহণযোগ্য সমঝোতায় উপনীত হন, যার ফলে মহেন্দ্র প্রতাপ মুসলমানদেরকে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব প্রদানে সম্মত হতে বাধ্য হন।

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র) মাওলানা আনসারী ও মাওলানা সাইফুর রহমান রাহিমাহুমাল্লাহ-এর পরামর্শে আফগানিস্তানে অবস্থানরত স্বাধীনতাকামী আলেম-উলামা ও নওজোয়ান ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এবং শায়খুল হিন্দ (র)-এর সে দেশীয় শিষ্যদের সমন্বয়ে 'জুনুদে রাব্বানী' নামে একটি সশস্ত্র সংগ্রামী বাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন, যারা তৃতীয় আফগান যুদ্ধে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল। পরে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠিত হলে এ বাহিনীকে তাদের হাতে ন্যস্ত করা হয়। -দেওবন্দ আন্দোলন : ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান-২০২-২০৩

১৯১৬ইং সালের ২৪ শে জানুয়ারী অস্থায়ী ভারত সরকারের সাথে তিনি এ মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। যে চুক্তির ভাষ্য ছিল এরূপ যে, 'আফগান সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবেন, তুর্কী ফৌজ আফগান সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করবে। আফগান সরকার বৃটিশ সরকারকে এ মর্মে কৈফিয়ত দিবে যে, সিমান্তের উপজাতীয়দের বিদ্রোহ আফগান সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল; যে কারণে তুর্কীদেরকে ঠেকানো সম্ভব হয়নি তবে ব্যক্তিগতভাবে কেউ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাইলে এ ব্যাপারে তার কোনরূপ আপত্তি থাকবেনা।'

এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র) ও আমীর নাসরুল্লাহ খান উক্ত চুক্তিনামার বিষয়বস্তু আক্রমণের তারিখসহ আরবীতে রূপান্তর করেন। তারপর একজন দক্ষ কারিগর দ্বারা একটি রেশমী রুমালের গায়ে সেই আরবী ভাষ্য সুতার সাহায্যে অংকিত করে সেটিকে মক্কায় অবস্থানরত শায়খুল হিন্দ (র) এর নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এই অভিনব পন্থা অবলম্বনের মূল হেতু ছিল বৃটিশ বাহিনীর কড়া তল্লাশী এড়ানো এবং তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে খবরটি নির্বিঘ্নে মদীনায় পৌঁছানো।

চুক্তিপত্ররূপী এই রুমালটি বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র)-এর একনিষ্ঠ ভক্ত এবং পূর্ব থেকেই এ কাজে জড়িত নওমুসলিম শায়খ আব্দুল হককে নিযুক্ত করা হয়। তিনি আফগান ও ভারতের মাঝে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। কথা ছিল তিনি এ রুমালটি সিন্ধুর শায়খ আবদুর রহীমের নিকট পৌঁছে দিবেন এবং শায়খ আব্দুর রহীম হজ্জ করতে গিয়ে তা শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র)-এর হাতে পৌঁছে দিবেন।

কাবুলে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র) এর অবস্থা

এদিকে ১৯১৭ সালের জুন মাসে বৃটিশ সরকারের নির্দেশে আমীর হাবীবুল্লাহ খান কাবুলে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র)-কে ও বিপ্লবী দলের অপরাপর নেতৃবৃন্দকে নজরবন্দি করেন এবং অস্থায়ী ভারত সরকারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র) সহ তাদের ২০/২৫ জনকে ছোট্ট একটি কুঠুরিতে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। পরে মাও. সিন্ধীকে জালালাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়। অবশ্য ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে আমানুল্লাহ খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দীর্ঘ ১ বৎসর আট মাস পর মাও. ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে কারামুক্ত করে কাবুলে ফিরিয়ে আনেন। এর পর থেকে তিনি তিন বৎসর আটমাস আমানুল্লাহ খানের আস্থাভাজন হিসাবে আমান উল্লাহর সরকারের কল্যাণে কাজ করে যান। এসময় তিনি সেখানে অস্থায়ী ভারত সরকারের বিকল্প হিসাবে কংগ্রেসের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯১৯ সালের মে ও জুনে আমান উল্লাহর সাথে বৃটিশ ভারতের যে যুদ্ধ হয় তাতে মাওলানা মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র)-এর 'জুনূদে রব্বানীর' লোকেরা যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। ফলে আমান উল্লাহর বাহিনী জয়ী হয়। কাবুলস্থ বৃটিশ দূত হেমথ্রে বলেছিলেন এ বিজয় আফগান সরকারের নয় বরং এ বিজয় ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর।

সর্বমোট ৭ বছর ৭ দিন কাবুলে অবস্থান করার পর আন্তর্জাতিক চাপের মুখে তাকে বাধ্য হয়ে কাবুল ছাড়তে হয়। ১৯২২ সালে ২২শে অক্টোবর তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য নতুন ক্ষেত্র তৈরির উদ্দেশে রাশিয়ার পথে যাত্রা করেন। এভাবেই তাদের এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। আপাত দৃষ্টিতে তাদের আন্দোলনের যবনিকাপাত ঘটলেও মুলত সে আনোদলনই যুগে যুগে যুগিয়েছে স্বাধীনতার ইন্ধন।

তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ

১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ কী সিয়াসী তাহরীক

২. মেরী ডায়েরী

৩. রুদাদে জমিয়াতুল আনসার

৪. সীরাতে খাকাহ-তারীখে দারুল উলূম ১ম খ. পৃ. ৫৩৩, ৫৪০।♦

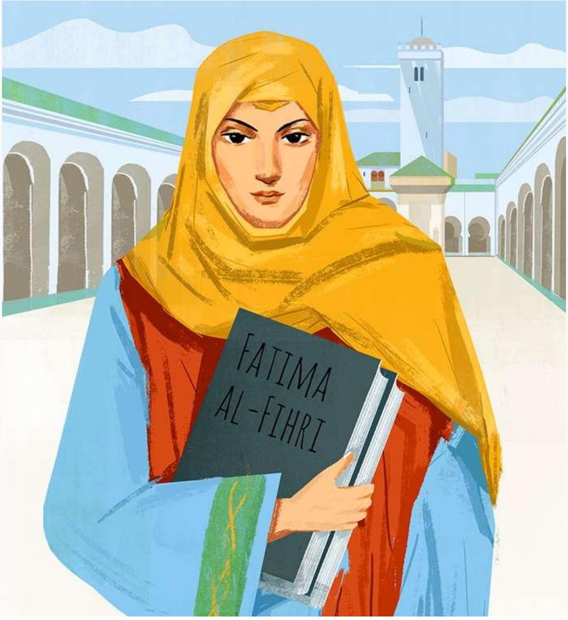

শিল্পীর দৃষ্টিতে ফাতিমা আল-ফিহরি

ফাতিমা আল-ফিহরি

বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে নারী

মোজাম্মেল হোসেইন তোহা

আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে নামকরা দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যামব্রিজ এবং অক্সফোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যথাক্রমে ১২০৯ এবং ১০৯৬ সালে। তবে পুরো বিশ্বের তো বটেই, এগুলোর কোনোটিই ইউরোপেরও প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। ইউরোপের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়, ইতালির বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১০৮৮ সালে। তারও প্রায় একশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়।

কিন্তু আল-আজহারেরও প্রায় একশ বছর বা অনেক আগে, আজ থেকে প্রায় সাড়ে এগারোশ’ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মরক্কোর কারাউইন ইউনিভার্সিটি।

ইউনেস্কো এবং গিনেজ বুক অফ ওয়ার্ল্ডের রেকর্ড অনুযায়ী এটিই হচ্ছে বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, যা এখন পর্যন্ত একটানা চালু আছে। আর এই ঐতিহাসিক বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একজন মুসলিম নারী, ফাতিমা আল-ফিহরি!

ফাতিমা আল-ফিহরির জন্ম আনুমানিক ৮০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে, বর্তমানকালের তিউনিসিয়ার কাইরাওয়ান শহরে। তার পুরো নাম ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ আল-ফিহরিয়া আল-কুরাইশিয়া। তাদের পারিবারিক নামের কুরাইশিয়া অংশ থেকে ধারণা করা হয় তারা ছিলেন কুরাইশ বংশের উত্তরাধিকারী।

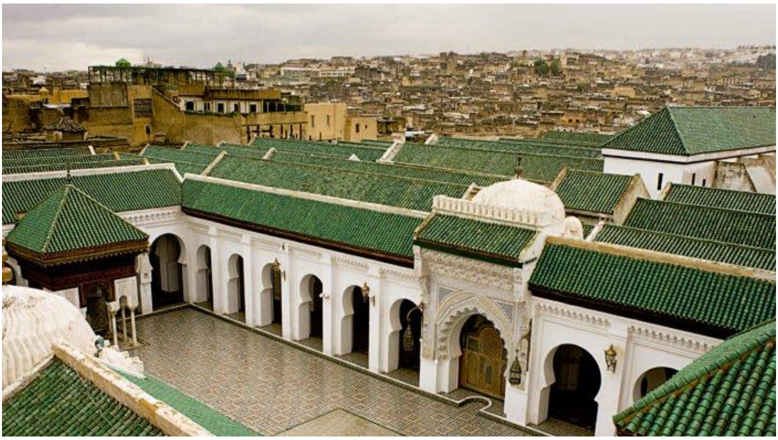

কারাউইন ইউনিভার্সিটি; Image Source: feslamedumaroc.com

তিউনিসিয়ার কাইরাওয়ান শহরটির গোড়াপত্তন হয়েছিল উমাইয়া শাসকদের হাতে ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে। নবম শতকের শুরুর দিকে শহরটি হয়ে উঠেছিল ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সামরিক দিক থেকেও শহরটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই শহরে বসবাসরত আল-ফিহরি পরিবারসহ অনেকেই ছিল আর্থিকভাবে অসচ্ছল। ফলে ফাতিমার জন্মের কয়েক বছর পর নবম শতকের শুরুর দিকে কাইরাওয়ান শহরের বেশ কয়েকটি পরিবার একত্রে শহরটি ছেড়ে ভাগ্যের অন্বেষণে পাড়ি জমায় ইসলামিক মাগরেবের প্রসিদ্ধ শহর, মরক্কোর ফেজের উদ্দেশ্যে।

ফেজ ছিল তখন ক্রমবর্ধমান কসমোপলিটন শহর। নানা দেশ থেকে নানা ধর্ম, বর্ণ ও পেশার মানুষ সেখানে এসে বসতি স্থাপন করছিল। সে সময় ফেজের শাসক ছিলেন সুলতান দ্বিতীয় ইদ্রিস। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমান এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক। বিদেশ থেকে আগত অভিবাসীদেরকে তিনি ফেজ নদীর তীরের ঢালু জমিতে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দেন। কাইরাওয়ান থেকে আসার

কারণে ফেজে বসতি গড়া এই অভিবাসীদের পরিচয় হয় কারাউইন, তথা কাইরাওয়ানের অধিবাসী নামে।

ফেজে এসে মোহাম্মদ আল-ফিহরির ভাগ্য খুলে যায়। প্রচণ্ড পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি নিজেকে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার সন্তানদের জন্য তিনি সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ফাতিমা আল-ফিহরি এবং তার বোন মারিয়াম আল-ফিহরি ক্লাসিকাল আরবি ভাষা, ইসলামিক ফিক্হ এবং হাদিস শাস্ত্রের উপর পড়াশোনা করেন।

কারাউইন ইউনিভার্সিটি; Image Source: AP

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর এই ফেজ শহরেই ফাতিমার বাবা তাকে বিয়ে দেন। কিন্তু বিয়ের কয়েক বছরের মাথায়ই ফাতিমাদের পরিবারে দুর্যোগ নেমে আসে। অল্প সময়ের মধ্যেই তার বাবা, ভাই এবং স্বামী মৃত্যুবরণ করেন। রয়ে যান কেবল এতিম দুই বোন ফাতিমা এবং মারিয়াম। বাবার রেখে যাওয়া বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির উত্তরাধিকার হন তারা।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী পিতার কাছ থেকে পাওয়া সম্পত্তি ব্যয় করার ক্ষেত্রে কন্যারা কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য না। ফাতিমা এবং মারিয়ামও চাইলে এই সম্পত্তি যেকোনোভাবে ব্যয় করতে পারতেন। কিন্তু কোনো বিলাসিতার পেছনে ব্যয় না করে তারা সিদ্ধান্ত নেন, এই অর্থ তারা ব্যয় করবেন ধর্মের জন্য, মানবতার কল্যাণের জন্য। সাজসজ্জার কিংবা বিলাসিতার পণ্য ক্রয় না করে সিদ্ধান্ত নেন, তারা ক্রয় করবেন জনগণের ভবিষ্যত।

ফেজের খ্যাতি তখন দিনে দিনে বেড়েই চলছিল। দেশ-বিদেশ থেকে মুসল্লিরা এসে শহরটিতে বসবাস করতে শুরু করছিল। ফাতিমা এবং মারিয়াম লক্ষ্য করেন, ফেজের কেন্দ্রীয় মসজিদটি শহরের ক্রমবর্ধমান মুসল্লিদেরকে আর

স্থান দিতে পারছে না। ফলে তারা সিদ্ধান্ত নেন, বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তি দিয়ে তারা পৃথক দুটি মসজিদ নির্মাণ করবেন। প্রায় কাছাকাছি সময় দুই বোন কাছাকাছি এলাকায় দুটি পৃথক মসজিদ নির্মাণ করেন। মারিয়াম নির্মাণ করেন আন্দালুস মসজিদ, আর ফাতিমা নির্মাণ করেন কারাউইন মসজিদ।

ফাতিমা সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য জানা যায় না, এমনকি তার প্রতিষ্ঠিত কারাউইন লাইব্রেরিতেও না। ধারণা করা হয়, তার উপর লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলো কারাউইন লাইব্রেরির ১৩২৩ সালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হয়ে গেছে। সবচেয়ে পুরাতন যে উৎসে ফাতিমার বিবরণ পাওয়া যায়, সেটি হলো চতুর্দশ শতকের ইতিহাসবিদ ইবনে আবি-জারার লেখা ফেজ শহরের ইতিহাস, The Garden of Pages। পরবর্তীতে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুনও ফাতিমার কথা লিখেছেন, কিন্তু তাতে ইবনে আবি-জারার বর্ণনাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

কারাউইন মসজিদ; Image Source: Image Source: AP

ইবনে আবি-জারার বিবরণ থেকে জানা যায়, ফাতিমা প্রথমে তার মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি ক্রয় করতে শুরু করেন এবং এরপর ৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের ৩ তারিখে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। সেটা ছিল পবিত্র রমজান মাসের এক শনিবার। ফাতিমা শুধু মসজিদ নির্মাণের জন্য অর্থ দান করেই নিজের দায়িত্ব শেষ করেননি। তিনি নিজে সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত থেকে এর নির্মাণকাজ তদারকি করেছিলেন এবং শুরুর দিন থেকে শুরু করে নির্মাণ শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি দিন তিনি রোযা রেখেছিলেন।

কিছু বর্ণনা অনুযায়ী, মসজিদটির নির্মাণ সম্পন্ন হতে সময় লেগেছিল ১৮ বছর, যদিও অন্য কিছু বর্ণনা থেকে ১১ বছর এবং ২ বছরের বর্ণনাও পাওয়া যায়।

যেদিন নির্মাণ শেষ হয়, সেদিন তিনি নিজের নির্মিত মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করে নামাজ আদায় করেন এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। জন্মভূমি কাইরাওয়ানের নামানুসারে তিনি মসজিদটির নাম রাখেন কারাউইন মসজিদ।

কারাউইন লাইব্রেরিতে ইবনে খালদুনের মুকাদ্দিমা; Image Source: AP

মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর ফাতিমা মসজিদের বর্ধিতাংশে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি ব্যাকরণ, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস, রসায়ন, ভূগোলসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান শুরু হয়। বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় বিষয়ের উপর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য ডিগ্রী প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেই এটিই প্রাচীনতম, যা এখনও টিকে আছে এবং গত সাড়ে এগারোশ' বছর ধরে একটানা শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে আলোকিত করে আসছে।

ফাতিমা আল-ফিহরির প্রতিষ্ঠিত কারাউইন মসজিদটি দীর্ঘদিন পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকার বৃহত্তম মসজিদ ছিল। তার মৃত্যুর পর ৯১৮ সালে সরকার মসজিদটিকে অধিগ্রহণ করে এবং একে সরকারি মসজিদ হিসেবে ঘোষণা করে, যেখানে সুলতান নিয়মিত নামায আদায় করতে শুরু করেন। দ্বাদশ শতকের দিকে পুনরায় পরিবর্ধনের পর এটি একসাথে ২২,০০০ মুসল্লিকে ধারণ করার সক্ষমতা অর্জন করে।

ফাতিমার প্রতিষ্ঠিত কারাউইন মসজিদ এবং কারাউইন ইউনিভার্সিটিকে কেন্দ্র করে ফেজ হয়ে উঠতে থাকে আফ্রিকার ইসলামী শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। শুধু মুসলমান না, মধ্যযুগের অনেক খ্যাতিমান ইহুদি এবং খ্রিস্টান মনীষীও এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন। এর ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন পোপ দ্বিতীয় সিলভাস্টার, যিনি এখান থেকে আরবি সংখ্যাপদ্ধতি বিষয়ে ধারণা

লাভ করে সেই জ্ঞান ইউরোপে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং ইউরোপীয়দেরকে প্রথম শূন্যের (০) ধারণার সাথে পরিচিত করেছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকতার সাথে যুক্ত ছিলেন বিখ্যাত মালিকি বিচারপতি ইবনে আল-আরাবি, ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন এবং জ্যোতির্বিদ নূরুদ্দীন আল-বিতরুজি। প্রতিষ্ঠার পরপর ফাতিমা নিজেও কিছুদিন এখানে অধ্যয়ন করেছিলেন।

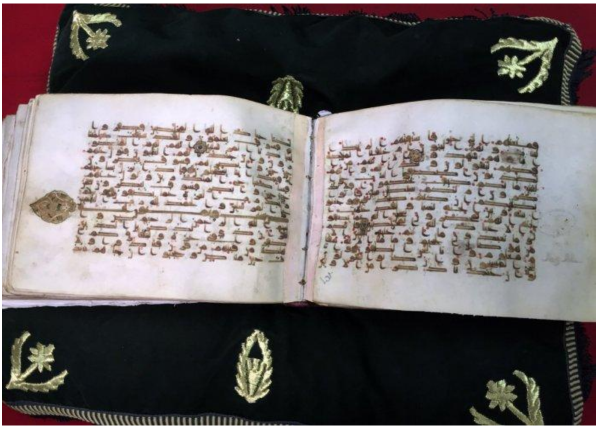

কারাউইন লাইব্রেরিতে নবম শতকের কুরআন শরিফ; Image Source: AP

কারাউইন ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিটিকেও বিশ্বের প্রাচীনতম লাইব্রেরি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আগুনে পুড়ে বিপুল সংখ্যক পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও এখনও এতে প্রায় ৪,০০০ প্রাচীন এবং দুর্লভ পাণ্ডুলিপি আছে। এর মধ্যে আছে নবম শতকে লেখা একটি কুরআন শরিফ, হাদিসের সংকলন, ইমাম মালিকের গ্রন্থ মুয়াত্তা, ইবনে ইসহাকের লেখা রাসূল (সা)-এর জীবনী, ইবনে খালদুনের লেখা কিতাব আল-ইবার এবং আল-মুকাদ্দিমার মূল পাণ্ডুলিপিসহ বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ।

ফাতিমা আল-ফিহরি ইন্তেকাল করেন ৮৮০ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু তার প্রতিষ্ঠিত কারাউইন মসজিদ, ইউনিভার্সিটি এবং লাইব্রেরি আজও দাঁড়িয়ে আছে সগৌরবে। তার প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গত সহস্রাধিক বছরে লক্ষাধিক শিক্ষার্থী পাশ করে বেরিয়েছে। তার স্বদেশী আরব, মুসলিম বিশ্ব এবং সর্বোপরি মানব সম্প্রদায়কে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করার ক্ষেত্রে এবং বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে ফাতিমার অবদান অপরিসীম।♦

সৌজন্যে : roar media

ফারাও তুতেনখামেনের রহস্যাবৃত ট্রামপেট

মুহাম্মাদ আযান

বিরান মরুভূমিতে তখনও আসেনি শীত, প্রকৃতি তখনও পরিধান করতে শুরু করেনি কুয়াশার মুখোশ। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ...পাওয়া গেলো এক দুর্লভ অনুমোদন। মিশরের যে উপত্যকায় পাঁচশত বছর ধরে পাথার কঠিন মাটি কেটে ফারাওদের জন্যে তৈরি করা হয়েছিলো জাঁকজমকপূর্ণ সমাধি, অবশেষে সে উপত্যকা খননের অনুমোদন পাওয়া গেলো– অনুমোদন পেলেন লর্ড ক্যানাভেন। এই সেই রহস্যাবৃত উপত্যকা, যাকে পৃথিবীর মুসাফিরেরা চিনে 'ভ্যালি অফ দ্য কিংস' নামে। অতঃপর ভ্যালি অফ দ্য কিংসে শুরু হলো খননের কাজ...এই সমস্ত কাজ তদারকি করার ভার যার উপরে ন্যস্ত করেছিলেন পৃষ্ঠপোষক লর্ড ক্যানাভেন, তিনি ছিলেন ব্রিটিশ আর্টিস্ট ও ইলাস্ট্রেটর স্যামুয়েল জন কার্টারের কনিষ্ঠতম সন্তান হাওয়ার্ড কার্টার।

খননের কাজ চলছে শ্লথ গতিতে– কখনও মরুভূমি, কখনও বা নীল নদ অতিক্রম করে আসা বাতাস ছুঁয়ে দিচ্ছে বিট্রিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ হাওয়ার্ড কার্টার ও তার অধীনস্থ খননকারীদের। প্রকৃতিকে শীতলতা দিয়ে জড়িয়ে নিতে ধীরে ধীরে আর্বিভূত হয়েছে শীত। সমস্ত রাত্রি কুয়াশায় ভিজতে থাকা ভ্যালি অফ দ্য কিংসের মাটির দিকে তাকিয়ে নভেম্বরের সেই সব সকালে কি বলতেন হাওয়ার্ড কার্টার

ফিসফিসিয়ে, তা এক বিস্ময়! যা বহুকাল পূর্ব হতেই নির্ধারিত, তা বদলের সুযোগ কোথায়! খননের কাজ শুরু হবার পরপরই শুরু হয়ে গেলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

যে যুদ্ধকে বলা হয়ে থাকে সকল যুদ্ধের অবসান ঘটানোর যুদ্ধ, সেই যুদ্ধের তখনও হয়নি শেষ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিট্রিশ সরকারের কূটনীতিক দূত ও অনুবাদক হয়ে কাজ করা হাওয়ার্ড কার্টার মনস্থির করলেন ফের ভ্যালি অব দ্য কিংসে ফিরে আসবেন। যার শিরায় বাহিত রক্তে প্রাচীনতার প্রতি অসীম আকর্ষণ, তাকে ফিরিয়ে রাখা দুষ্কর– অতএব ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে ভ্যালি অফ দ্য কিংসে আবারও ফিরে এলেন হাওয়ার্ড কার্টার। শুরু হলো ফের অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও খননের কাজ। দেখতে দেখতে কেটে গেলো আরও পাঁচটি বছর, কিন্তু ততদিনেও পাওয়া গেলো না কোনো আশাপ্রদ ইঙ্গিত। শেষে লর্ড ক্যানাভেন অসন্তুষ্ট হয়ে আলোচনায় বসলেন হাওয়ার্ডের সাথে– আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হলো এই যে, আর মাত্র একটি ঋতু অবধি যাবতীয় খরচ বহন করবেন লর্ড ক্যানাভেন।

গভীর রাত্রি...থিব্যান নেক্রোপলিসে অবস্থিত নিজ গৃহের ছোট্টো বিছানায় শুয়ে ভাবছেন হাওয়ার্ড কার্টার এই অবস্থায় কি করণীয় তার! পরদিন ভোরে ভ্যালি অফ দ্য কিংসে গিয়ে হাওয়ার্ড র‍্যামেসাইড পিরিয়ডে নির্মিত হওয়া কুঠিরগুলো আরও একবার গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। পর্যবেক্ষণ শেষে হাওয়ার্ড নিয়োজিত খননকারীদের কুঠিরগুলো পরিষ্কার করে এদের নিম্নস্থ পাথুরে ধ্বংসাবশেষ সরাতে বললেন। সময়ের ঘূর্ণনে সকালকে বিলীন করে দিতে বহু পথ অতিক্রম করে এসেছে সূর্যের জ্যোতি...পাহাড়ে, পাথরে, বিরাণ ভূমিতে কেবলই রোদের ঘ্রাণ- পিপাসিত খননকারীরা, পিপাসিত হাওয়ার্ড কার্টার। হুসেন আব্দুল-রাসোল নামক যে যুবক প্রতিদিন তাদের জন্যে বয়ে আনতো সুমিষ্ট জল, ১৯২২ সালের চৌঠা নভেম্বরের দুপুরে সে বালক যখন একইভাবে বয়ে আনছিলো জল, তখনই দুর্ঘটনাবশত একটি পাথরের সাথে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন তিনি।

আপাতদৃষ্টিতে যা দুর্ঘটনা বলে প্রতীয়মান হয়, কখনও কখনও তার অন্তরালে উঁকি দেয় পরম সৌভাগ্য। যদি জল বহনকারী এ যুবক সে দুপুরে পাথরে ধাক্কা লেগে হোঁচট না খেতেন, তাহলে হয়ত কখনওই নিরেট প্রস্তরের ন্যায় মাটির ভেতরে খোদিত সিঁড়ির প্রথম ধাপটির সাক্ষাৎ মিলতো না। হাওয়ার্ড কার্টার সুদক্ষ খননকারীদের নিয়ে আংশিকভাবে সিঁড়ির ধাপগুলো খনন করতে লাগলেন, যতক্ষণ না চুন ও কাদামাটি দিয়ে পলেস্তার করা দ্বারটি খুঁজে পাওয়া গেলো। দ্বারে মুদ্রিত করা অস্পষ্ট হায়ারোগি-ফিক দেখে ঠিক বুঝতে পারলেন না হাওয়ার্ড কি লিপিবদ্ধ করা আছে সেখানে! কি এক ভেবে হাওয়ার্ড কার্টার সিঁড়ির ধাপগুলো আবারও পাথর দিয়ে পূর্ণ করে দেবার আদেশ দিলেন...

টেলিগ্রাফ পাওয়ার আড়াই সপ্তাহ পরে লর্ড ক্যানাভেন তার একুশ বছর বয়সী কন্যা ইভলিন হারবার্টকে সঙ্গে নিয়ে থিব্যানে হাওয়ার্ড কার্টারের গৃহে চলে আসেন। হাওয়ার্ড কার্টার যে ইভলিনকে শৈশব থেকেই চিনতেন, তাকে যুবতী বয়সে কখনও কালো রংয়ের স্লিভলেস পোশাকে দেখে বিমোহিত হয়েছেন কিনা তা আমার জানা নেই। একবিংশ শতাব্দীতে বসতরত আমার ইভলিনকে মুখোমুখি দেখবার সুযোগ না হলেও আমি তাকে দেখেছি, দেখেছি সাদাকালো ছবির ভেতর দিয়ে- ছড়ানো বাঘের চামড়া উপরে দীর্ঘ মালা গলায় জড়িয়ে বসে থাকা ইভলিনের নগ্ন বাহু, ম্যাগনোলিয়া ব্লসোমের মতো সুকোমল চেহারা, আর কোঁকড়ানো চুল আমাকে সম্মোহিত করেছিলো- আমি জানি না হাওয়ার্ড কখনও তার প্রেমে পড়েছিলেন কিনা, তবে আমি ইভলিনের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকা নিষ্পাপ চোখের রহস্যময় চাহনির প্রেমে পড়েছিলাম তৎক্ষণাৎ।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর দীর্ঘ আলখাল্‌রা ও মাথায় হ্যাট পরিহিত ইভলিন প্রত্নতত্ত্ববিদ হাওয়ার্ড কার্টার ও পিতা জর্জ হারবার্টের (লর্ড ক্যানাভেন) সাথে প্রস্তর সিঁড়ির ষোলোটি ধাপ পেরিয়ে হায়ারোগ্লিফিক মুদ্রিত করা দ্বারের সমুখে উপস্থিত হলেন– তাদের উপস্থিতিতে হাওয়ার্ড যে বাটালি তার ১৭তম জন্মদিনে দাদীর কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন তা দিয়ে দ্বারটির ডানপাশের হাতলের উপরের দিকে ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র করেন। মোমের মৃদু আলোতে প্রথমে হাওয়ার্ড কার্টার ভেতরকার কিছু ঠাওর করতে না পারলেও, ক্রমেই তার চোখ সে আলোতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। যতবারই বহুকাল ধরে ভেতরে আটকে পড়া বাতাস ধাবিত হচ্ছিলো মোমের দিকে, ঠিক ততবারই মোমটির শিখা দপ করে জ্বলে উঠছিলো– আর এই আলোতেই হাওয়ার্ড দেখতে পেয়েছিলেন বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও গুপ্তধন। তখনও হাওয়ার্ড নিশ্চিত হতে পারছিলো না এটি কি আদৌ কোনো সমাধি, নাকি পুরাতন কোনো গুপ্তধনের ভাণ্ডার! খানিক পরেই তার নজরে পড়ে দু'টি রক্ষাকারী মূর্তির মাঝে অবস্থিত অপর একটি আবদ্ধ দ্বার– এ আবদ্ধ দ্বারটিই হাওয়ার্ডের মনে আশা জাগিয়ে ছিলো। অনেকটা সময় পেরিয়ে গেলে পেছন থেকে ক্যানাভেন প্রশ্ন করে, 'তুমি কি কিছু দেখতে পেয়েছো?' জবাবে বললে হাওয়ার্ড বিখ্যাত সেই শব্দসমূহ, 'হ্যাঁ, অত্যাশ্চর্য সামগ্রী।' পরবর্তী সময়ে তুতেনখামেন সম্পর্কিত যে সমস্ত গ্রন্থ হাওয়ার্ড কার্টার রচনা করেছিলেন, সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'প্রথমে আমি দেখতে পাইনি কিছুই। কক্ষের ভেতর থেকে আগত তপ্ত বায়ুর প্রভাবে মোমবাতির শিখা হঠাৎ হঠাৎই জ্বলে উঠছিলো আরও তীব্রভাবে। যখন আমার চোখগুলো ধীরে ধীরে সে আলোর সাথে গড়ে তুলতে সমর্থ হলো মিতালী, তখন আমার যুগল চোখে আবছায়া থেকে ক্রমেই কক্ষের সকল কিছু

প্রতীয়মান হতে লাগলো- আমি দেখতে পেলাম অদ্ভুত সব প্রাণী, মূর্তি সমূহ ও স্বর্ণ...সকল জায়গায় থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো স্বর্ণের দ্যুতি।'

প্রথম প্রবেশদ্বার থেকে অধোগামী সংকীর্ণ গলি পেরিয়ে পৌঁছাতে হয় দ্বিতীয় প্রবেশদ্বারের নিকটে। এ সংকীর্ণ গলিটি চুনাপাথরের টুকরো দিয়ে পূর্ণ করে রাখা হয়েছিলো, যাতে কবর লুণ্ঠনকারীরা সহজে দ্বিতীয় দ্বারের কাছে পৌঁছাতে না পারে। দ্বিতীয় দ্বার দিয়ে প্রবেশ করার পরই হাওয়ার্ড কার্টার সাক্ষাত পেয়েছিলো প্রায় সাতশ সামগ্রীর। এসব সামগ্রীর ভেতরে ছিলো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কিত তিনটি বিছানা, ঘোড়ায় চালিত চারটি চ্যারিয়েট- সম্ভবত এ চ্যারিয়টগুলোর একটি শিকার, একটি যুদ্ধ ও অপর দুইটি সামরিক প্রদর্শনীর সময়ে ব্যবহৃত হতো। এছাড়া পাওয়া গিয়েছিলো এক বিশালাকৃতির সিন্দুক যার ভেতরে ছিলো সেনাবাহিনীর জিনিসপত্র ও ১৩০ টি ওয়াকিং স্টিকস।

রেনেসাঁসেরও বহুকাল আগ হতেই মিশরে ছিলো চিত্রকলার বিস্তার। বিভিন্ন দেবদেবীর চিত্রকর্ম ও বুক অফ দ্য ডেটে সংকলিত স্পেল দিয়ে চিত্রায়িত তুতেনখামেনের ব্রুয়িলাল চেম্বার সে চিত্রকলারই এক নিদর্শন– এ চেম্বারের ভেতরকার ঐশ্বর্য ও গুপ্তধন অজস্র জাতিকে আজ অবধি সম্মোহিত করে রেখেছে। এ বুরিয়াল চেম্বারের প্রায় সম্পূর্ণটা দখল করে রেখেছিলো যে চারটি বৃহদাকার স্বর্ণাবৃত কাঠের বাক্স, তাদের ভেতরেই পরিবেষ্টিত ছিলো ফারাও তুতেনখামেনের শবাধার- আর পরিবেষ্টিত এ শবাধারকে চারদিক থেকে পাহাড়া দিচ্ছিলো চারজন দেবী– আইসিস, নেপথিস, সারকেট, নিথ। এই শবাধারের ভেতরে তিনটি মমি আকৃতির কফিনে সংরক্ষিত ছিলো তুতেনখামেনের মমি করা দেহ– এ তিনটি মমি আকৃতির কফিনের প্রথম দুইটি যেখানে স্বর্ণাবৃত কাঠের ছিলো, সেখানে তৃতীয় কফিনটি ছিলো সম্পূর্ণ স্বর্ণের। হাওয়ার্ড যখন তৃতীয় কফিনটির ভেতরে শায়িত থাকা তুতেনখামেনের মমি আবিষ্কার করলেন, তখন দেখতে পেলেন বুক অবধি

বিস্তৃত স্বর্ণের মুখোশ দ্বারা তা আবৃত করা। তুতেনখামেনের মুখচ্ছবির ন্যায় এ মুখোশটি স্বর্ণ ছাড়াও ল্যাপিস লাজুলী, কার্নেলিয়ান, কোয়ার্টজ, অবসিডিয়ান সহ নানা রকম মূল্যবান রত্ন ও পাথর দিয়ে অলংকৃত করা ছিলো।

অ্যান্টিচেম্বার, বুরিয়াল চেম্বার ছাড়াও তুতেনখামেনের পরবর্তী জীবনে যাতে খাদ্য সহ অন্য কিছুর অভাব না হয়, সেজন্যে ছিলো ট্রেজারি ও অ্যানেক্স নামে অভিহিত দু'টি কক্ষ। সব মিলিয়ে এ চারটি কামরায় ৫০০০'র অধিক সামগ্রী পাওয়া গিয়েছিলো। পরবর্তীতে এ সকল সামগ্রীর ভেতরে সবচেয়ে রহস্যাবৃত বলে বিবেচিত হয়েছিলো দু'টি ট্রামপেট (ভেঁপু)। এই ট্রামপেট দু'টির ভেতরে যেটি তামা নির্মিত ছিলো তা পাওয়া গিয়েছিলো অ্যান্টিচেম্বারে, আর খাঁটি রূপা দিয়ে নির্মিত ট্রামপেটটি পাওয়া গিয়েছিলো ভিন্ন একটি কক্ষে। পুরাতাত্ত্বিক অভিযানের ফলে তিন হাজার বছরের অধিক সময় পরে মিশরীয় দেব-দেবী ও সামরিক অভিযানের দৃশ্য খোদিত করা ট্রামপেট দু'টির 'পরে পতিত হয়েছিলো আলো। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যাতে ট্রামপেট দু'টি নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্যে এদের ভেতরে স্থাপিত করা হয়েছিলো ট্রামপেট আকৃতির চিত্রায়িত উডেন কোর।

রেক্স কিটিং নামের একজন রেডিও উপস্থাপক ও ডকুমেন্টারি প্রস্তুতকারী ১৯৩৯ সালে ট্রামপেট দু'টি সম্পর্কে জানতে পেরে তৎকালীন মিশরীয় রাজা ফারুক ও হাওয়ার্ডের পুরাতাত্ত্বিক অভিযানের সময়কার একজন সদস্যের সাথে সাক্ষাৎ করেন। রেক্স কিটিং তাদের বুঝাতে সমর্থ হন যে যদি এ ট্রামপেট দু'টির ধ্বনি রেডিওর মাধ্যমে সম্প্রচারিত করা যায়, তবে তা বিশ্বব্যাপী তুতেনখামেনের সমগ্র বিষয়াদিকে আরও একবার তীব্রভাবে প্রজ্বলিত করে তুলতে পারবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তুতি চলতে থাকে। হুজার রেজিমেন্টের এক ঐকতান বাদক প্রস্তুতির সময়ে যখন তামা নির্মিত ট্রামপেটটি বাজায়, তখন তা কান বিদীর্ণকারী ধ্বনির সৃষ্টি করে। অঘটনের শুরু তখন থেকেই যখন ঐ ঐকতান বাদক একটি আধুনিক মাউথপিস সিলভার ট্রামপেটের প্রান্তদেশে প্রবেশ করিয়ে তাতে ঠোঁট স্পর্শ করিয়ে

ফুঁ দেন, আর সাথে সাথে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। অন্যদিকে হাওয়ার্ডের পুরাতাত্ত্বিক অভিযানের সদস্য আলফ্রেড লুকাস স্ক্রিপ্ট হাতে নিয়ে রেডিওর সামনে বসে যখন অভিযান সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেন, তখন এমনই উন্মাদ প্রায় হয়ে ওঠেন যে তাকে সাথে সাথে হাসপাতালে পাঠাতে হয়।

ইতোমধ্যে সিলভার ট্রামপেটটি যখন পুনঃসংস্কার করা হয়ে যায়, তখন সে অসফল বাদকের পরিবর্তে জেমস টেপের্ন নামক অপর এক বাদককে নিয়োগ দেয়া হয়। দ্বিতীয় সম্প্রচারের আগে প্রেস মিডিয়া থেকে শুরু করে সকল রকম প্রচার মাধ্যম এ নিয়ে বার্তা প্রকাশ করতে থাকেন। অতঃপর দ্বিতীয় সম্প্রচারের সময়ে ট্রামপেট দু'টিতে পরপর ফুঁ দেবার সাথে সাথে কায়রো মিউজিয়ামের সকল বাতি বন্ধ হয়ে যায়। সকল চেষ্টার পরেও যখন বাতি জ্বালানো সম্ভব হলো, তখন মোমবাতির আলোতেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। অবশেষে ১৯৩৯ সালের বসন্ত ঋতুর শুরুতে বিভিন্ন দেশের প্রায় ১৫০ মিলিয়ন মানুষ শুনতে পেলো জেমস টেপেনের ফুঁয়ে ধ্বনিত হওয়া ট্রামপেট দু'টির গা ছমছমে ধ্বনি। কিন্তু কে জানতো তখন এরপর থেকেই শুরু হবে এক কালো রহস্যের শুরু। হ্যাঁ! বিট্রিশ বাদক জেমসের ট্রামপেট বাজানোর পাঁচ মাস পরই শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ– আর এ যুদ্ধে বিট্রেনও অংশগ্রহণ করে। এরপরে আবারও যখন ১৯৬৭ সালে সিলভারের ট্রামপেটটি বাজানো হয়, তার পরপরই শুরু হয়ে যায় আরব ও ইসরায়েলের ভেতরে যুদ্ধ। তখন মিশরীয় বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদদের অনেকেই বলেন যে, নিশ্চয়ই এ ট্রামপেট দু'টির সাথে জড়িত রয়েছে ডার্ক মিস্টিক্যাল ফোর্সেস কিংবা ডার্ক ম্যাজিক। পরবর্তীতে দীর্ঘ ২৩ বছর পরে ১৯৯০ সালে ট্রামপেটটি ফের যখন বাজানো হয়, তার কিছুদিন পরই পার্সিয়ান উপসাগরে শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ। ট্রামপেট দু'টো বাজানো সম্পর্কে নানা রকম নিষেধাজ্ঞা আরোপিত করা হলেও, ১৯১১ সালে আবারও ট্রামপেট দু'টির একটি মনের খেয়ালে বাজিয়ে ফেলেন কায়রো মিউজিয়ামের একজন কর্মচারী। কি আর হবে...সে একই রহস্যের পুনরাবৃত্তি, মিশরে অকস্মাৎ শুরু হয়ে যায় বিদ্রোহ।

১৯১১ সালের পর ট্রামপেট দু'টি আর বাজানো হয়নি, হয়ত সকলে এতদিনে বিশ্বাস করে নিয়েছে বহুকাল পূর্বে বলা ইজপ্টোলজিস্ট খালা হাসান ও মিশরীয় পুরাতত্ত্ব বিষয়ক মন্ত্রী জাহি হেওআসের কথা, 'ট্রামপেট দু'টির সাথে জড়িত রয়েছে ডার্ক মিস্টিক্যাল ফোর্সেস।'♦

করুণা-মাঙন

হাসান হাফিজ

দমে দমে নাম কার?
শুধুমাত্র মহান আল্লাহর।
এই ভবে আমরা সবে
ক্ষণিক অতিথি
আল্লাহর নৈকট্য চাই
একদিন পাবো তাই
সুদৃঢ় সে আস্থা ও প্রতীতি।
নিঃশ্বাসে বিশ্বাসে প্রভু
একমাত্র তোমারই শরণ লই
বান্দা পাপী, তোমার করুণা ছাড়া
গতি মুক্তি কই?

বারোমাসে বারোরাশি

প্রত্যয় জসীম

আমিতো বাংলাচাষী– বারোমাসে বারোরাশি
বৈশাখ এলে হাসি– মাঘে শুধু কাশি

ফাগুন ভালোবাসি– শ্রাবণে জলেভাসি
জৈষ্ঠে আম কাঁঠাল– ভাদ্রে পাকা তাল

চৈত্রে রোদটা চরম– পৌষে শীতটা নরম
আষাঢ়ে বৃষ্টিতে ধরা– অগ্রাণে ফসলে খরা
আশ্বিনে হঠাৎ ঝড়... কার্তিকে চিটাধান শুধু খড়

আলপথে ঘুমানো বাংলাচাষী– প্রকৃতি আমার কন্যা
অভাগার বারোমাসে বারোরাশি– ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা... ।

এলো আজ বৈশাখ

আ শ ম বাবর আলী

এলো আজ বৈশাখ–নতুনের দূত,
আকাশটা কালো মেঘে সাজে অদ্ভুত।
ওই মেঘ ডেকে বলে এই ধরাটাকে–
‘তব শুভ কল্যাণে দেব আপনাকে।
ঝড়ে দেব উড়িয়ে যে সব জঞ্জাল,
পানি দিয়ে ধুয়ে দেব মাঠ-পথ-খাল।
বুক চিরে আলো দেব পৃথিবীর বুকে,
গর্জনে শত্রুকে দেব আমি রুখে।
মোরে দেখে তোমরা সব কেন করো ভয়?
অশুভের বিরুদ্ধে আমি দুর্জয়।’

বিগত বছরের ভুলে যাও শোক,
নতুনের যাত্রা কল্যাণ হোক।

জেগে ওঠো বাংলাদেশ

সমীর আহমেদ

আজও কুয়াশায় ভেজে নক্ষত্রফুল! তোমাদের স্বপ্নচূড়ায়
কারা বারবার ঠুকে দেয় বিষাদের পেরেক? সিঁড়ির ধাপে
পড়ে থাকা একটি ভাঙা চশমা আমাকে ঘুমাতে দেয় না।
আহা! এতটা নিকটে কীভাবে অবস্থান করে স্বপ্ন ও ঘাতকের
বুলেট? উন্নয়নের ধাপে বসে তোমার গায়ে হাতুড়ির শব্দ
শুনে ভাবি, তাহলে এতটাই এগোলো দেশ! আবারও সিঁড়ির
ধাপে উঠে আসছে ঘাতকের ছায়া। দু' চোখে আর কতকাল
জমিয়ে রাখবে কুশায়ার নদী? এবার জেগে ওঠো একাত্তরের
বাংলাদেশ। সিঁড়ির ধাপ থেকে চিরতরে মুছে ফেল ঘাতকের ছায়া।

জ্যোতির্ময় পদ্মলোচন

আশরাফুল আযম খান

যখন চারিপাশ উদ্ভাসিত আলোর চেরাগে,
তখন স্বচ্ছ-সরোবর-অরণ্যের গহিন হরিণ চোখ
আর কোথাও দেখি না
দেখি না মায়াবি সেই চোখ, সেই সব নয়ন তারা
এখন সহস্র চোখের তারায় দেখি
কেবল ধূর্ত শিকারির ছায়া
ঘৃণা আর স্বার্থপরতার সীমাহীন চলচ্ছবি।
কাজল কালো, খঞ্জনা বা পাখির নীড়
যে উপমাই দেওয়া চলুক না কেন তাদের
সে সব চোখ থেকে আজকাল ক্রমশ
ঝরে পড়তে দেখছি ঘৃণা আর হিংসার লালা
সে সব চোখ থেকে দ্রুত লাফিয়ে পড়ছে
ধূর্ত শেয়ালমুখো রাশি রাশি অন্ধকার
সে সব চোখে এখন যত কামনার ঝড়,
বটবৃক্ষের মতো উন্মুলিত হয়ে আছে–
পৃথিবীর শুভ জ্যোতি, হিরন্ময় বর্ণমালা
ভালোবাসার পুষ্ট সকল অঙ্গীকার।

আমি অন্তর্লীন বেদনায় হোমারকে সাথে নিয়ে
যখন লিখতে বসেছি
এসব মানুষের দৃষ্টি-পরাভবমুক্তির কাব্য–
তখন কে যেন পিছন থেকে
আমারই চোখে মাখিয়ে দিলো
দৃষ্টিবধ করা পুরো আস্তরের
অলৌকিক এক হলুদ ছানি।

আমাকে ক্ষমা করো হে ভবিষ্যতের
জ্যোতির্ময় পদ্মলোচন।

হালখাতা

আতাতুর্ক কামাল পাশা

অনন্য এক সত্য কথা বলে যায় পৃথিবীর মানুষ
সৃষ্টির মাঝে গেছে থেকে এক সুন্দরের কথা

চেতনা সজাগ করে বলিষ্ঠ পেশীর ঘায়ে পাহাড়ের বুকে
এঁকে দেবে সেই নাম গৌরব চুঁড়ে আলোর দ্যুতিতে
বলে দেব ভালোবাসি ভালোবাসি সত্যপাঠ নিতে
গগনে তুলবে মাথা নীল নীল জলে
হাত বাড়াবে সবার সাথে
করবে ভ্রাতার আচরণ
বলবে তোমায় হে প্রভূ!
সবার সাথে মিলিয়ে রেখ
মানবতা যেন না হারায় কভূ

লেখা হোক, এ বিশ্ব সভায় সেই হালখাতা।

বোশেখ মানে স্বপ্ন দেখা

মঈনুল হক চৌধুরী

বোশেখ এলে কৃষ্ণচুড়ায় আগুন লাগে
নতুন ভোরে সোনা রোদের জোয়ার জাগে।

ক্লান্তি ফুরোয় সব অবসাদ দূর হয়ে যায়
দল বেঁধে সব বনের মাঝে পাখিরা গায়।

গ্রাম বাংলায় হালখাতা হয় নতুন সাজে
যাত্রা পালায় ঢ্যাম কুড় কুড় বাদ্য বাজে।

নৃত্য করে সন্নাসীরা ঢোলের তালে
নদীর বুকে হাওয়া লাগে নৌকা পালে।

উথাল পাথাল কালবোশেখী ধুলো মেখে
প্রকৃতিতে কাঁপন জাগায় থেকে থেকে।

বাতাস যখন বৃষ্টি নামায় একটু থেমে
শীতল হাওয়া প্রকৃতিতে আসে নেমে।

আমের বনে কাঁচা আমের গন্ধ ভাসে
সূয্যিমামা ছড়িয়ে আলো একটু হাসে।

বোশেখ মানে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখা
নতুন করে শপথ নিয়ে বাঁচতে শেখা।

অপেক্ষা

মারইয়াম মনিকা

উঁচু সিঁড়িগুলো ভাঙতে ভাঙতে ডুবে যাচ্ছে সাগরে
বুকের ভেতর ফেঁপে ওঠা সমস্ত ব্যথা
সময়ের সূতোয় আটকে যায়;
সুখের জানালায় ঝুলে থাকে যে চুমুগুলো
সময় ফুরালে তা হেসে ওঠে
স্বপ্নের শিয়রে বসে এঁকে যায় শতাব্দীর পদচিহ্ন।

অন্তহীন নীলিমা পেরিয়ে
মৃত্যু-ঘ্রাণে ভরে যায় রজনীগন্ধার বাগান
গনিকালয়ের উঁচু দেয়ালের ভেতর
ছটফট করতে থাকে নিষ্পাপ কিশোরীর সতী আত্মা।

পারিজাত ফুলের সুবাসে গলে যায় পাথরের দরজা
লাশকাটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে আঁধারের মতো দীর্ঘশ্বাস;
বুকের গহীনের ধূ-ধূ তেপান্তরের উচ্চারিত হতে থাকে-
আর কতো ক্ষয় আর কতো ব্যথা আর কতো দুঃশাসন!
শরীরের নিবিড় ছায়ায় ভেসে ওঠে গাঢ় অন্ধকারের সমুদ্র
শুধু অপেক্ষা অপেক্ষা; যুগ-যুগান্তরের অপেক্ষা;
কাল- মহাকালের অপেক্ষা নক্ষত্র ঝরার অপেক্ষা
ফুল ফোটার অপেক্ষা প্রেমের অপেক্ষা
জাড়ুল গাছে সমস্বরে দুটি হলদে টিয়ে ডাকার অপেক্ষা!
একদিন নীল কস্তুরীর আভায় ভরে উঠবে এ পৃথিবী– সেই অপেক্ষা।

মুখ

শামস সাইদ

বসন্তের দুপুরটা বড়ই অদ্ভুত। আকাশে মেঘ নেই। তবু আলোটা ম্যারম্যারে। নেই রোদের তেজ। দীর্ঘ ঘুম ভেঙেছে পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিঃসঙ্গ গাছগুলোর। ছুটে চলা বাতাসের গায়ে লেগে তির তির করে কাঁপছে নবীন পাতা। সে বাতাসের শরীরে বারুদের গন্ধ মাখা। তখনো ম্লান হয়ে যায়নি স্বাধীনতার আনন্দ। হারিয়ে যায়নি স্বজন হারানো বেদনা। ধ্বংস স্তুপ ঠেলে দাঁড়াতে পারেনি শহরের বাড়িঘর। ধ্বংসাত্মক উম্মাদনার নিচে চাপা পড়ে আছে শোকার্ত আর্তনাদ। যারা হারিয়ে গেছে বাড়ি ফেরেনি তারা। ভুলে যায়নি পথ। ওরা ফিরবে না। কেন

ফিরবে না? জীবন বেচে দিয়েছে দেশের বিনিময়। রক্ত দিয়ে কিনেছে স্বাধীনতা। তবু অপেক্ষা শেষ হচ্ছে না বৃদ্ধা মায়ের। জীর্ণ শরীরের বাবার। তারা স্বপ্ন দেখছেন ফিরে আসবে ছেলে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে যে ছাই হয়েছে সেখানে ওঠেনি নতুন ঘর। সেই গাছে ফুল ফোটেনি যা পুড়েছিল হিংসার আগুনে। তবু নতুন স্বপ্ন বুনেছেন মালি। বাগান সাজাবেন। গানের দোকান খুলে বসেছে কোকিল। পথ ভোলা এক বাউল সুরের তানপুরা বাজাচ্ছে সেই দুপুরে। মাতাল করে তুলছে নির্জনতার দেয়াল ভেঙে। হৃদয়ের গহীনে বুদ বুদ করে উঠছে প্রেমের ফোয়ারা। রংয়ের বাহার ছড়িয়ে উড়ছে প্রজাপতি। ম্লান করে দিচ্ছে ফুলের সৌন্দার্য। অভিকে কোলে নিয়ে হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন ছোট চাচা গোলাম রহমান। বড্ড মন খারাপ তার। উদাসদুপুর আরও বেশি উদাস করে দিয়েছে। এতটা মলিন মুখ যে দৃষ্টি রাখা যায় না। মনে তার ভেসে বেড়াচ্ছে অন্য একটা মুখ। যে মুখ বেদনায় বিদির্ণ করে দিচ্ছে বুক। সেই বেদনার্ত হৃদয় নিয়ে অপেক্ষা করছেন একটি কণ্ঠস্বরের। যে চীৎকার করে উঠবে। তার ধ্যান ভাঙবে। অন্ধকার মুখে ফুটবে হাসি।

সেই ভরদুপুরে চীৎকার করে উঠল উর্মি। তখনো নাম রাখা হয়নি। এটা তার প্রথম চীৎকার। সে চীৎকার আর্তনাদের নয়। আনন্দেরও নয়। আগমনের। কণ্ঠফাটা এই চিৎকার স্পর্শ করেনি গোলাম মোস্তফার কান। ছুটে আসেননি। কেন আসেননি? আসার কথা ছিল তার। হারিয়ে যেতে চেয়েছিলেন আনন্দে। ইচ্ছেও ছিল। এসব নিয়ে মনের আঙিনায় সাজিয়েছিলেন স্বপ্নের বারান্দা। ক্যালেন্ডারের পাতায় সংখ্যা কেটে কেটে হেঁটে যাচ্ছিলেন এই দিনটাকে স্পর্শ করতে। স্বপ্নগুলো ভাসছে হাওয়া। তিনি আজ নেই। হারিয়ে গেছেন দূর অজানায়।

সেই দুপুর হেঁটে চলছে আট বছর। অভি হেঁটেছে তার থেকে নয় মাস বেশি। তার থেকে তিন মাস কম হেঁটেছে উর্মি। এখন তারা স্কুলে যায়। পথ আলাদা নয়। তবু চুপচাপ থাকে অভি। খুব একটা কথা বলে না। গম্ভীর মুখ তার। হাজারটা প্রশ্ন উর্মির। সব প্রশ্নই অভির কাছে। একটারও উত্তর দেয় না সে। এক দুপুরে বাড়ির পথে হাঁটছিল অভি। উর্মির একটা প্রশ্ন থামিয়ে দিল আচমকা। তাকাল বোনের মুখের দিকে। সেই প্রশ্নটা, তাদের বসার ঘরে ওই ছবিটা কার?

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল অভি। উত্তর করল না। উর্মির কৌতূহল ছবি। আবারও প্রশ্ন করল ভাইয়ের হাত ধরে। জানিস না তুই?

মাথা নাড়ল অভি। হ্যাঁ, জানে।

বলতো ওটা কার ছবি? আমি দেখিনি ছবির মানুষকে।

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে অভি বলল, বাবার ছবি।

বাবা! চমকে উঠল উর্মি। বাবা শব্দটা তার কাছে একদমই অচেনা। খুব একটা শোনেনি। বাবা কী জানেও না। খানিক পরে আবার প্রশ্ন করল, বাবার ছবি আছে, তা বাবা কোথায়? বাড়িতে আসে না কেন?

জানি না। বলে পায়ের দিকে তাকাল অভি। চোখে তার জল। উর্মি বুঝতে পারল কষ্ট পাচ্ছে ভাই। তাই নতুন প্রশ্ন করল না। তবে মনে তার গেঁথে রয়েছে বাবা শব্দটা। আট বছরে সে একবারও মুখে আনেনি এই শব্দ। ছোট বেলায় ডেকেছিল কিনা জানে না। স্কুল থেকে ফিরে সেই ছবির সামনে দাঁড়াল উর্মি। দেখছে স্থির দৃষ্টিতে। কিন্তু মন তার ভরছে না। বিরক্তও হচ্ছে না। চোখ সরাতে পারছে না ওই ছবি থেকে। খুঁটে খুঁটে দেখছে বাবার মুখ। এরপর বসল কাগজ আর রং পেন্সিল নিয়ে। বাবাকে আঁকবে। কতদিন চেষ্টা করেও পারেনি। বহু কাগজ কালি নষ্ট করার পরে চূড়ান্ত মন খারাপ হয়েছিল। তবু থেমে থাকেনি। একদিন হঠাৎ বাবার মুখ ভেসে উঠল কাগজে। সে কী আনন্দ উর্মির। ছুটে এলো ভাইয়ের কাছে। চমকে দেবে। সে ছবি দেখে সত্যি চমকে গেল অভি। অনেকক্ষণ পরে জানতে চাইল, তুই একেছিস?

মুখে হাসি মাখিয়ে মাথা নাড়ল উর্মি। বুকে তার অনেক কষ্ট। তাই হাসিটা অল্পক্ষণেই ম্লান হয়ে গেল। জানতে চাইল, বাবার মতো হয়নি?

কথা বলছে না অভি। কিছুক্ষণ পরে উর্মি বলল, একটা কথা বলবি ভাই?

মাথা নাড়ল অভি। বল। কী কথা জানতে চাচ্ছিস। বাবাকে দেখেছিস তুই? সত্যি ওই ছবির মতো ছিল বাবা? বাবা এখন কোথায়? কত বড় হয়েছি আমি, তবু দেখিনি বাবার মুখ। খুব ইচ্ছে করে দেখতে। বাড়িতে ফিরবে না বাবা?

মান খারাপ হলো অভির। অন্যদিকে মুখ করে মাথা নাড়ল। না, বাবাকে দেখেনি সে। তবে ওই ছবিটা বাবার। মা, চাচা, দাদি সবার মুখে শুনেছে। তুই যেটা একেছিস, ওটা ঠিক বাবার মুখ। বাবা দূরে থাকলেও তোর হৃদয়ে আছে। তাই আঁকতে পেরেছিস।

উর্মির মনে হলো ভাই তার কাছে সত্যটা বলেনি। বাবাকে দেখেছে ও। তার কাছে লুকাচ্ছে। তাই মায়ের কাছে ছুটে গেল। এই প্রথম মায়ের সামনে তুলল বাবার কথা। বাবা কোথায় আছে জানতে চায়নি। প্রশ্ন বাবাকে দেখেছে ভাই?

হঠাৎ এমন প্রশ্ন। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন মা। মনে পড়ল সেই সকালের কথা। কত স্বপ্ন আর ভালোবাসা হারিয়ে গেল তার কুয়াশায়। ফেরেনি সেই স্বপ্ন। পুরনো দুঃখে নিমজ্জিত হলেন নতুন করে। স্মৃতির জানালা থেকে সরে গেল পর্দা। ভেসে উঠল সেই মুখ। সামলাতে পারলেন না নিজেকে। নিঃশব্দে নেমে আসছে চোখের জল। উর্মি অস্থির, সে জানতে চায় বাবাকে দেখেছে অভি?

আঁচলে চোখ মুছে মাথা নাড়লেন মা। হ্যাঁ, দেখেছে। যে সকালে তোর বাবা হারিয়েছে সেরাতে খুব কান্না করেছিল অভি। বাবার কোলে উঠে শান্ত হয়েছিল। কী বুঝেছিল ছোট্ট অভি জানি না। অভিকে খুব আদর করত বাবা। অফিস থেকে ফিরেই কোলে তুলে নিত। ঘুমন্ত মুখেও চুমু খেত। শেষবার অভি দেখেছে বাবার মুখ।

আমায় আদর করত না বাবা?

গম্ভীর মুখে মা বললেন তোকে তো দেখেনি বাবা। সেই সকালের মাস তিনেক পরের এক দুপুরে তোর জন্ম। তোকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল। সেই মুখটা দেখতে পারেনি। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মা।

মন খারাপ হলো উর্মির। তার মুখ দেখেনি বাবা। আদর করেনি। ভাইকে দেখেছে। ওরে কত ভালোবাসত। শেষবার ভাই দেখেছে বাবার মুখ। তারপর হারিয়ে গেছে। কেন হারাল? মায়ের কাছে তা জানতে চায়নি উর্মী। ছুটে এলো ভাইয়ের কাছে। দাঁড়াল মুখোমুখি। অভিমানের কণ্ঠে বলল, তুই মিথ্যা বলছিস।

ঘাবড়ে গেল অভি। মিথ্যা বলছি!

বাবাকে দেখেছিস। তোকে অনেক আদর করত বাবা। যে সকালে হারিয়েছে বাবা সেই সকালে সবাই ঘুমিয়ে ছিল। তুই ছিলি বাবার কোলে। শেষবার বাবার মুখ দেখেছিস তুই। তারপর বাবা হারিয়ে গেছে। আমাকে দেখেনি। জলে ভরে উঠল চোখ। অনেকক্ষণ কেঁদে চোখ মুছল। বলল, বাবাকে দেখতে চাই আমি। কোথায় হারিয়েছে বাবা?

জানি না। বিশ্বাস কর। বাবাকে দেখিনি আমি।

বিশ্বাস করি না। মিথ্যা বলছিস। বাবাকে দেখেছিস তুই। মা বলেছেন।

জানি না , আমি কিচ্ছু জানি না। মনে পড়ছে না। আমি শুধু জানি ওই ছবিটা বাবার।

অনেকক্ষণ পরে উর্মি বলল, বাবাকে খুঁজে আনবি? পারবি না খুঁজে আনতে? কত বড় হয়েছিস তুই। পারবি। তোর কাছে আর কিছু চাই না ভাই। শুধু বাবাকে এনে দিস। খুব ইচ্ছে করে বাবার মুখ দেখতে।

বোনকে সান্ত্বনা দেয় অভি। কাঁদিস না। বাবাকে খুঁজে আনব। শান্ত হ তুই।

কান্না হারাল উর্মির চোখ। ম্লান মুখে ফুটল হাসি। সত্যি বলছিস ভাই? আনবি, বাবাকে খুঁজে আনবি?

মাথা নাড়ল অভি। হ্যাঁ, বাবাকে খুঁজে আনবে। কিন্তু ভাবছে সে অন্য কথা। কোথায় খুঁজবে বাবাকে। জানে না বাবা বেঁচে আছে না মারা গেছে। চাচা অনেক

খুঁজেও পায়নি। বাবা হারিয়ে গেছে। এক সময় মা বলত বাবা আকাশে। এখন সে বুঝতে পারে আকাশে কেউ হারায় না। ওখানে আশ্রয় নেয়। বহুবার সে আকাশকে বলেছে ফিরিয়ে দাও বাবাকে। আকাশ শোনেনি তার কথা। উর্মীকে বলেছে বাবাকে খুঁজে আনবে। না বললে ও কান্না করত। থামত না সে কান্না। বলত বাবাকে দেখেছিস তুই। আমি কেন দেখিনি। আরও কাঁদবে। ওর কান্না থামলে একদিন বুঝিয়ে বলবে বাবা ফিরবে না। হারিয়ে গেলে কেউ ফেরে না।

২.

উর্মীর মনে নতুন স্বপ্ন। বাবা ফিরে আসবে। ভাই বলছে বাবাকে খুঁজে আনবে। তারপর অনেক দিন কেটে গেছে, বাবাকে খুঁজতে যায় না অভি। অস্থির হয়ে এক বিকেলে ভাইয়ের সামনে দাঁড়াল উর্মি। তুই তো বললি বাবাকে খুঁজে আনবি। তা যাচ্ছিস না তো বাবার খোঁজে।

সে অনেক দূরের পথ। ছোট চাচাকে নিয়ে যেতে হবে। আমি একা পারব না।

চাচাকে বলব আমি?

না না , তোর বলতে হবে না। আমি বলব।

এক দুপুরে মন খারাপ করে অভি দাঁড়াল ছোট চাচার সামনে। চাচা জানতে চাইলেন কী হয়েছে অভি? তোর যে মন খারাপ। কিছু বলবি?

মাথা নাড়ল অভি। তারপর ধরা কণ্ঠে বলল, বাবাকে খুঁজে আনতে বলে উর্মি। ও কান্না করছে। বাবাকে কোথায় পাব বলো তুমি।

নিচু হয়ে পড়ল চাচার মাথা। আট বছরেও বাবার কথা ভুলতে পারেনি ওরা। বাবাকে নিয়ে ওদের কৌতূহল আরও বাড়ছে। ভুলতে পারবে না। কোনোদিন ভুলতে পারবে না। বাবা ওদের কাছে একটা শব্দ। যার কোনো অস্তিত্ব নেই। মুখ তুলতে পারছেন না চাচা। ক্রমশ ডুবে যাচ্ছেন বেদনার জলে। অভিও নড়ছে না। বাবার খোঁজ চায় সে। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুললেন। করুণ দৃষ্টি রাখালেন অভির

মুখে। দেখছেন বাবা হারানো এক শিশুর ম্লান মুখ। যে বাবার খোঁজ চায়। কত কষ্ট ওর বুকে। সান্ত্বনা দিতে পারছেন না। পারছেন না বাবার শূন্যস্থান পূরণ করতে। মুখ তুলে বললেন, তোর মন কী বলছে অভি, বেঁচে আছেন তোর বাবা?

ভেজা চোখে অভি তাকাল চাচার দিকে। দুঃখে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল, জানি না। বেঁচে না থাকলে তো বাবার কবর থাকবে। বেঁচে থাকলে বাড়ি ফেরবেন। বাবা বলতে জানি একটা ছবি। এর বাইরে কিছু না। বাবার মুখ দেখতে চায় উর্মী। চলো, একদিন খুঁজে দেখি। হয়তো বাবা আছেন। পথ হারিয়ে ফেলেছেন। তাই ফিরতে পারছেন না।

কোথায় খুঁজবে?

যেখানে হারিয়েছে বাবা। তুমি না বললে কত খুঁজেছ। মিরপুর, রায়েরবাজার। ওখানেই একদিন যাব। বাবাকে না পেলেও উর্মীকে বলতে পারব বাবার খোঁজতে গিয়েছিলাম। পাইনি। ও শান্ত হবে। এক সময় ভুলে যাবে বাবার কথা। মনে করবে বাবা মানেই ছবি। জানো চাচা, ওর ভেতর একটা কষ্ট দেখেছি আমি।

চাচা জানতে চাইলেন, কী কষ্ট?

কিছুক্ষণ সময় নিয়ে অভি বলল, যখন কেউ বাবা ডাকে, ওর চোখ জলে ভরে যায়। এতটা দুঃখ জড়ো হয়, ওর মুখে দৃষ্টি রাখা যায় না। মলিন হয়ে যায়। তখন আমারও খুব কষ্ট হয়। কান্না করে দিল অভি।

কান্না আটকে রাখতে পারলেন না ছোট চাচা। অভিকে বুকে জড়িয়ে শব্দ করে কেঁদে উঠলেন। ভাই হারানো কষ্টের থেকে বেশি কষ্ট দিচ্ছে অভি আর উর্মির হাহাকার। চোখ মুছে দাঁড়ালেন চাচা। বললেন, কালই তোর বাবার খোঁজে যাব।

আমিও যাব তোমার সাথে।

হ্যাঁ, তোকে নিয়ে যাব। সেদিন থেকে খুঁজে ফিরছি আমি। আজও হাঁটছি পথ হারিয়ে পথে। ভাবছি ফিরে আসবেন ভাই। আসেননি। এই খোঁজ শেষ হবে না অভি। শেষ হয়ে যাবে পথ। তোরও খুঁজতে হবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। যা দেখবি তা আঁকড়ে ধরেই বাবাকে খুঁজে ফিরবি। কিন্তু বাবাকে পাবি না। বাবা আর ফিরবে না।

৩.

পর দিন সকালে চাচাকে নিয়ে বাবার খোঁজে বের হলো অভি। উর্মীকে বলল বাবার খোঁজে যাচ্ছি। নিয়ে আসব। তোর খুব আনন্দ হবে।

উর্মী হাসল মুখ ভরে। বাবা ফিরে আসবে। এর থেকে আনন্দ কিছু নেই তার কাছে। অভিকে নিয়ে চাচা এলেন মিরপুর, রায়েরবাজার। গাড়ি থেকে নেমে হাঁটলেন। অনেকক্ষণ হেঁটে দাঁড়ালেন। অভিকে দেখালেন সেই স্মৃতিজড়ানো

জায়গা। এখানে হারিয়েছে তোর বাবা। অভি চোখ বুলাচ্ছে দূর থেকে যত দূর পারছে। কোথাও দেখছে না বাবার মুখ। কুয়ার আরও কাছে গেল। কেউ নেই। এখানে থাকবে কেন বাবা? হয়তো চলে গেছে অন্য কোথাও। তবুও আশপাশ অনেকক্ষণ খুঁজল। পাতাটাও উল্টে দেখল। চোখ রাখল আকাশে, মেঘের ভাঁজে। সেখানেও নেই বাবার মুখ। মন খারাপ করে বলল, বাবা নেই এখানে। চলো অন্য কোথাও যাই।

অভিকে নিয়ে সামনের দিকে হাঁটলেন চাচা। গেলেন তুরাগের পাড়ে। নদীর দিকে তাকিয়ে আছে অভি। কেনই যেন মন বলছে ভেসে যায়নি তো বাবা। কার কাছে জিজ্ঞেস করবে বাবার খবর। মানুষ নেই। নিস্তব্ধ এলাকা। তাকাল চাচার দিকে। চাচা কিছু বলছেন না। অভি যখন বলবে তখন ফিরে যাবেন।

খানিক সামনে হাঁটল অভি। দেখল একটা ব্রিজ। লোহার। ভাবল ব্রিজের ওপাড় যাবে। বাবা থাকতে পারে ওদিকটায়। চাচাকে বলল, চলো ওপাড় যাই। দেখি বাবা আছে কিনা।

চাচা যেতে চাইলেন না। বললেন, ওপাড় গিয়ে কী করবি অভি। এখানে দাঁড়িয়েই তো সব দেখতে পাচ্ছিস। তোর বাবা থাকলে দেখতি না। কেউ নেই ওখানে।

কিছু বলল না অভি। দাঁড়িয়ে রইল স্থির পায়ে। ওপাড়ের সব দেখতে পাচ্ছে। কোথাও নেই কেউ। লুকিয়ে থাকার জায়গাও নেই। একজন মানুষ বসে আছে নদীর পাড়ে। খানিক আগেও তাকে দেখেনি। হঠাৎ কোথা থেকে এলো! কী যেন বলছে। জীর্ণ শরীর তার। মলিন কাপড়। এলোমেলো সাদা চুল। বাতাসে ওড়ছে। নদীর দিকে তাকিয়ে বলেই যাচ্ছে। কিছু বুঝতে পারে না অভি। চাচার কাছে ফিরে এসে বলল, চলো- ওই লোকটার কাছে যাই। বাবার খবর জানতে পারে। দেখ না কী সব বলছে একা একা। আমার মনে হচ্ছে উনি সব জানে।

কিছুটা বিরক্ত হলেন চাচা। লোকটা পাগল। দেখতে পাচ্ছিস না। কিছুই জানে না। এখানে ছিল না তখন। থাকলে মেরে ফেলত। ওপাড় যেতে হবে না। বাসায় চল।

তবু যাবে অভি। তাই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন চাচা। অভিকে নিয়ে সেই লোহার ব্রিজ পাড় হলেন। দাঁড়ালেন পাগলের সামনে। পাগলের পাগলামি নেই। চুপচাপ বসে আছে। হাঁটু ভেঙে। মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে গেছে ধনুকের মতো। নদীর দিকে তাকিয়ে আছে শ্যোন দৃষ্টিতে। একটা কথাও বলছে না। পাগলের সাথে কথা বলার কোনো ইচ্ছে নেই চাচার। বিমর্ষ মুখে অন্যদিকে ফিরে আছেন। অভি দেখছে পাগল। খানিক পরে মুখ তুলে হাতের ইশরায় অভিকে বসতে বলল।

অভি বসল তার পাশে। গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল পাগল, এখানে আইছ ক্যান? কেউ তো আয় না। আমিও যাই না কারো কাছে। বসে থাকি নদীর ওই পাড়ে দৃষ্টি ছড়িয়ে। দ্যাখি সেই দৃশ্য। যা হারায়া গ্যাছে। যা হারায়াছে তা সবাই দ্যাখতে পায় না। আমি পাই।

এসব শুনতে চায় না অভি। সে জানতে চায় বাবার খবর। বলল, আমার বাবাকে দেখেছেন?

হকচকিয়ে উঠল পাগল। কে তোর বাবা?

আ ন ম গোলাম মোস্তফা। আট বছর আগের এক সকালে বাবাকে তুলে এনেছে। আর ফেরেনি।

কারা তুলে আনল?

রাজাকার আর পাক আর্মিরা। তারপর নাকি এখানে নিয়ে এসেছিল। আমার বয়স তখন নয় মাস। আমার বোন জন্মেছে সেই সকালের তিন মাস পরের দুপুরে। ও দেখতে চায় বাবার মুখ। আমি ভুলে গেছি। এই আমার চাচা। অনেক খুঁজেছেন। পাননি। বোনের মুখে চোখ রাখতে পারি না। খুব কষ্ট হয়। ওর মনে অনেক কষ্ট। পাহাড় সমান হবে। তাই বাবার খোঁজে এসেছি। কোথাও দেখি না বাবার মুখ। না আকাশে, না জমিনে। বাবাকে না নিয়ে গেলে উর্মী খুব কান্না করবে। কিছুতেই থামবে না। আপনি জানেন আমার বাবা কোথায়? তাহলে বলেন। বাবাকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে চাই।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল পাগল। বাবা। বাবার খোঁজে আইছ। আহা বাবা। আমিও একজন বাবা। খুঁজে ফিরছি আমার স্ত্রী সন্তান। পাই না। কোথাও নাই।

তারাও হারিয়ে গেছে? জানতে চায় অভি।

পাগল ডুবে গেল সেই রাতে। যে রাত তাকে পাগল বানিয়েছে। চোখে তার ভরে উঠল জলে। অভি দেখছে তার মুখ। এখানেও কষ্ট আছে। কেন পাগলের মুখে এত কষ্ট। এরপর বলল, সেই রাতের তাণ্ডব দ্যাখছি আমি। যে রাতে সবাই হারিয়ে গ্যাছে। হারাতে পারি নাই আমি। আজও বাঁইচা আছি।

সেই তাণ্ডবের কথা জানতে চায় অভি। কী হয়েছিল সে রাতে?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে সামান্য নড়ে বসল পাগল। তারপর শুরু করল সেই রাতের কাহিনি। ব্রিজের উত্তর পাশে ছিল আমার বাড়ি। ছোট্ট ঘর। বাঁশ খুঁটির। স্ত্রী সন্তান নিয়ে থাকতাম। একটা সাইকেল ছিল। রোজ সকালে বেরিয়ে যেতাম কাজে। ফিরতাম সন্ধ্যায়। যুদ্ধ পাল্টে দিল জীবন। নিয়ে এলো ভয়। হারিয়ে গেল রোজগার। রান্ধা নাই। খাওয়া নাই। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকি। কখন ওরা আইয়া পড়ে। প্রাণ কাইরা ন্যায়। সেই অপেক্ষা শেষ হইলো এক রাইতে।

ঘুমাইছিলাম একটু। রাইত কয়টা কী হইছে জানি না। আমাগো আখড়াটা হঠাৎ জ্বইলা উঠল। পড়িমরি কইরা বাইর হইলাম। তখন গুলি ছুড়ল। এলোপাতাড়ি গুলি। পাগল কইরা দ্যাওয়ার অবস্থা। ঝাঁপ দিলাম নদীতে। ডুব দিয়ে এপাড় আইলাম। শুয়ে পড়লাম চরে। দ্যাখলাম জ্বলছে গ্রাম। আমার ঘর। চীৎকার করছে আমার স্ত্রীর, সন্তান। পারছি না ছুইটা যাইতে। এক সময় সেই চীৎকার থামল। সব খাইয়া আগুনও মরল। থেমে গেল আর্তনাদের শব্দ। কেউ বলছে না বাঁচাও। আমি নড়ছি না। এই গাছের নিচে বসে আছি। রাত পোহাইল। তখনো পরিষ্কার হয় নাই আকাশ। উইঠা খাড়াইলাম, বাড়ি যাব। দ্যাখলাম কিছু নাই। শশ্মান হইয়া গ্যাছে। পইড়া আছে ছাই। ওড়ছে বাতাসে। গন্ধ পোড়া মাংসের। ওপাড় গ্যালাম না আর। কার জন্য যাব। চোখ দুইটা ব্রিজে ঝুলাইয়া এই জায়গায় বইলাম।

গভীর রাইতে ওরা আইত। ধইরা আনত মানুষ। চোখ বানধা। ব্রিজের ওপর খাড়া কইরা গুলি করত। চিক্কর দিয়া উঠত। কেউ বাবা কইয়া, কেউ মা, কেউ আল্লাহ , কেউ হরি। ওই শেষ আওয়াজ। ধপাশ কইরা লাশ পড়ত নদীতে। ডুইবা যাইত পানিতে। আবার ট্রাক ভইরা মানু লইয়া আইত। মরা মানুষ। ফেইক্কা ফেইক্কা নদীতে ফ্যালত। ভাইসা যাইত লাশ। এই নদীতে জল দ্যাখা যাইত না। দ্যাখা যাইত রক্ত। লাশের ওপর লাশ ভাসত। কালির জামাইরে পুলের ওখান থেকে ধইরা লইয়া গ্যাল। ফিরল না আর। খবরও হইল না। হয়তো ভাইসা গ্যাছে। কত মানুষ লাশ হইল চোখের সামনে। মানুষ দ্যাইখা মানুষ ডরাইত। রান্ধা ভাতও খাইতে পারত না। গলা দিয়া নামত না।

পাগলের চোখে জল। ধরে আসছে গলা। বলতে পারছে না কথা। খানিক পরে আবার শুরু করল। আমাগো পাশের ঘর ছিল শোভার। সেই রাইতে ওরা ট্যার পাইছিল আগুনের। পোলাপান লইয়া বাইর হইয়া দৌড় দিল। পুলের ওই মুড়ায় গ্যাছে, আগুন জ্বলছে ঘরে। ভয়ে লাফাইয়া পড়ল নদীতে। জীবন বাঁচাইতে লড়াই কইরা হপায় এইপাড় ওঠছে। অমনি ধুমায়া গুলি। বাঁচতে পারল না। নদী সাঁতরাইল বৃথা। সবাইরে সেদিন মাইরা ফ্যালত। যারা মাটিতে শুয়ে পড়ছিল তারা রক্ষা পাইছিল। গোলাপীর জামাইর খুলি উইড়া গ্যাল। ফকির চানেরে ধইরা নিল। আবার ছাইড়া দিল। পরাণে বাঁচল। লাশ হইল না। ক্যান মারল না কী জানি। সবই তাদের ইচ্ছা।

চোখ মুছে পাগল বলল, এই বিলে কত লাশ ভাসছে। কত লাশ দ্যাখছি। এক দিন অনেক মানুষ ধইরা আনল ওরা। ব্রিজের ওপর দাঁড় করাইল, গুলি করবে। একজন সাহস কইরা ব্রিজের ওপর দিয়া লাফ দিল। তারে আর পাইল না। নদীর জলে ভাইসা ব্রিক ফিল্ডের দিকে গ্যাল। হামাগুড়ি দিয়া উইঠা কইল,

আমারে বাঁচাও, বাঁচাও। দূরের ওই বড়দেশী গ্রামের মানুষ নৌকা লইয়া আইয়া তারে বাঁচাইল।

সেই লোকটা আমার বাবা নাকি? প্রশস্ত মুখে জানতে চাইল অভি।

পাগল থ। কইল তা জানি না।

ওই লোকটা কোথায় আছে জানেন?

মাথা নাড়ল পাগল। জানেন না। তবে তোমার বাবা হইব না।

কী করে বুঝলেন? হতেও পারে আমার বাবা।

তোমার বাবা হইলে বাড়ি ফিরতেন।

হয়তো পথ হারায়া ফ্যালছেন। তাই ফেরতে পারেননি।

এবার পাগল চুপ। ছেলে ভাবতে চায় বাবা বেঁচে আছে। স্বপ্ন দেখতে চায় একদিন বাবা ফিরবে। মিথ্যা স্বপ্ন। বেদনায় ভারি হয়ে গেল তার বুক। অনেকক্ষণ পরে বলল, এই ব্রিজটা ছিল কসাইখানা। সারা রাত মানুষ কাটত ওরা। রাইত পোহাইলে সেই রক্ত ধুইয়া ফ্যালত বিহারিরা। লাশ ভাইসা যাইত নদীতে। মানুষের সেই চীৎকার আজও শুনি। আমার স্ত্রী ছেলেমেয়ের গলা কানে বাজে। বাঁচাও বাঁচাও কইয়া চীৎকার করছে। বাঁচাইতে পারি নাই। ওদের মুখ হারায়া গ্যাছে আগুনের প্যাটে। ছাই হইয়া গ্যাছে। নদীতে ভাসাইয়া দিছি ছাই। আকাশে উড়ায়া দিছি। তাই নদীর পাড়ে বইয়া থাহি। এই জলের মাঝে আছে ওরা। কেউ দ্যাখে না। আমি দ্যাখি।

পাগল উঠে দাঁড়াল। নামল নদীর পাড়ে। এক মুঠো মাটি তুলে আনল। ভিজাল জলে। তাকাল আকাশের দিকে। অভির চোখ পাগলের মুখে। সেই মাটির ধলা তুলে দিল অভির হাতে। বলল, এই নাও।

কী?

তোমার বাবা।

অভি দেখছে মাটির ধলা। পাগল বলছে বাবা। কেমন কথা। পাগল বলল, তোমার বাবা মিশে আছেন এই মাটিতে, জলে, আকাশে, বাতাসে। তুমি যেখানে যাবে সেখানেই দেখবে বাবার মুখ। তবু এই মাটিটুকু রাখো। এখানেই খুঁজে পাবে বাবাকে।

অভি তাকাল চাচার দিকে। গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন চাচা। একটা কথাও বলেননি। চুপচাপ শুনছেন পাগলের কথা। ভেতরে তার কষ্ট। মাটির ধলাটা হাতে নিল অভি। দেখল মুগ্ধ দৃষ্টিতে। এই তার বাবা। এরপর উঠল। চাচাকে বলল, চলো, বাসায় যাই।

সারা পথে একটা কথাও বলেনি অভি। চোখ তার আটকে ছিল মাটির ধলায়। মাটি না, এই তার বাবা। উর্মী দেখবে বাবার মুখ। চাচাও কিছু বললেন না। আট বছর আগের সেই যুদ্ধ দিনগুলোর কথা খুব করে মনে পড়ল তার।

উর্মী বসে আছে। বাবাকে নিয়ে আসবে ভাই। ভাত খায়নি দুপুরে। বাবার মুখ দেখবে। কত আনন্দ। মায়ের চোখে জল। পুরনো দুঃখগুলো উথলে উঠছে। জমে গেছে বুক। নিশ্বাস নিতে পারছেন না। দুপুর হারিয়েছে বিকেলের পেছনে। তখনো ফেরেনি অভি। মায়ের চিন্তা হচ্ছে। বাবার খোঁজে কোথায় গেল অভি। তখনই বেজে উঠল কলবেল। দরজার দিকে হাঁটলেন মা। তারও আগে ছুটে গেল উর্মী। বাবাকে নিয়ে এসেছে ভাই। উচ্ছ্বাসের জোয়ারে ভাসছে। দরজা খুলে দাঁড়াল। দেখল ভাই আর চাচা। বাবা নেই। সেই হাসিটা হারিয়ে গেল উর্মির। জড়িয়ে ধরল ভাইয়ের গলা। কেঁদে উঠল শব্দ করে। তুই যে বললি বাবাকে নিয়ে আসবি। বাবা কোথায়?

কথা বলতে পারছে না অভি। চোখের জলে ভাসছে গাল। উর্মীও কাঁদছে। চাচার সেই পাথর মুখেও জলের স্রোত। অনেকক্ষণ পরে উর্মীকে ছেড়ে দাঁড়াল অভি। হাতে দিল সেই মাটির ধলা।

উর্মী অবাক। এটা কী?

এখানে আছে বাবা। খুঁজলেই পাবি। সবাই দেখবে না। তুই দেখতে পাবি। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল মাটি আর পানি বাবার শরীর। যেখানে যাবি সেখানেই দেখবি বাবার মুখ। আকাশের দিকে তাকালে ওই পতাকায় দেখবি বাবার মুখ। কোথায় নেই বাবা! সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বাবা।

মাটির ধলাটা হাতে নিল উর্মী। চোখ মুছে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। মাটির ধলাটা হারিয়ে গেছে হঠাৎ। ভেসে উঠছে একটা মানচিত্র। তার ওপর একটা মুখ। মুখটা চেনা। তাকাল দেয়ালে সাঁটানো ছবির দিকে। সেই ছবির মুখটা ভেসে উঠছে মাটিতে। এই মাটিতে আছে তার বাবা। মাটির বুকে চুমু খেয়ে ফিক করে হেসে উঠল উর্মি। অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন মা। উর্মি হাসছে! এই যে কাঁদল। তাহলে বাবাকে খুঁজে পেয়েছে উর্মী! ♦

ইসলাম ও মহানবী (সা)

ফরাসি সাহিত্যিক ভিক্টর হুগো'র কথা ও কবিতায়

মুহাম্মদ ইসমাঈল

ফরাসি সাহিত্যের অন্যতম সেরা কবি ও গল্প লেখক এবং সাহিত্যে রোমান্টিসিজম ধারার পথিকৃৎ ভিক্টর হুগো (১৮০২-১৮৮৫) বেশ কয়েকটি উপন্যাস বা বড় গল্পের জন্য খ্যাতিমান হয়ে আছেন বিশ্ব সাহিত্য অঙ্গনে। তার বিখ্যাত লেখার মধ্যে রয়েছে– লে মিজারেবল বা 'নিঃস্বরা' (Les Miserables) ও Notre-Dame de Paris বা 'প্যারিসের নোতরদাম গির্জার কুঁজো' কোয়াসিমাদো (The Hunchback of Notre-Dame) এবং The Man Who Laughs বা 'যে ব্যক্তি হাসতো' ইত্যাদি।

প্রখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক হুগো অনেক কবিতা ও কয়েকটি নাটকও লিখেছেন। বাস্তবতা ও সমাজের অনুভবযোগ্য বাস্তবতা এবং সত্যকে জানার জন্য চিন্তাভাবনার গুরুত্ব তার কবিতা ও গল্পের প্রধান কয়েকটি বিষয়। 'প্রাচ্যতার কবিতা' নামে হুগোর একটি কাব্য সংকলনও রয়েছে। এ বইয়ের ভূমিকায় তিনি প্রাচ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরে লিখেছেন : 'চতুর্দশ লুইয়ের সময় সবাই ছিল গ্রিস-বিশেষজ্ঞ। বর্তমানে প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞ হওয়া উচিত এবং এশিয়ার জনগণের সংস্কৃতি ও সাহিত্য থেকে হতে হবে উপকৃত। অতীতে আর কখনও এত বেশি চিন্তাবিদ এশিয়ার সুবিশাল অঞ্চল সম্পর্কে গবেষণায় মেতে উঠতে সাহসী হননি। আর তাই প্রাচ্যের রঙগুলো আমার সমস্ত ভাবনা-চিন্তা ও কল্পনাকে ছেয়ে ফেলেছে।..

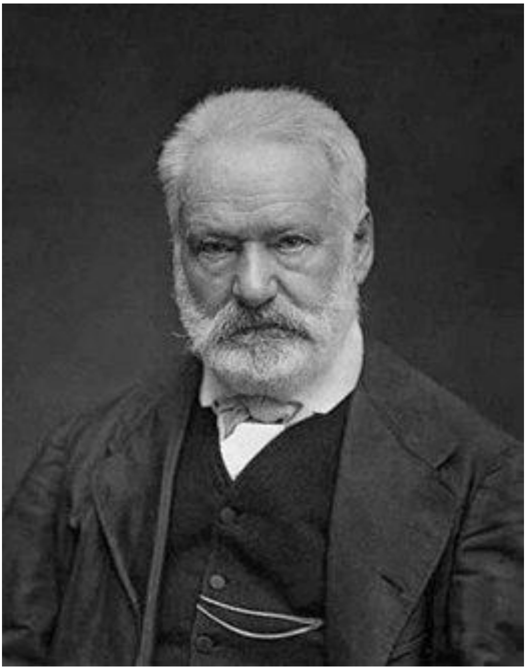

ভিক্টর হুগো

ভিক্টর হুগোর আরেকটি কবিতার বইয়ের নাম 'শতকগুলোর কিংবদন্তি'। বইটি তিনি লিখেছিলেন নির্বাসিত থাকার সময়। বইটির তৃতীয় অধ্যায়ের একটি দীর্ঘ কবিতা বা কাব্যের নাম হল 'হিজরতের নবম বছর'। এতে মহানবীর (সা) জীবনের শেষের দিকের কিছু ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। হুগো কবিতাগুলো এমনভাবে লিখেছেন যে তাতে বোঝা যায় মহানবীর (সা) জীবন সম্পর্কে তিনি

খুবই যথাযথ পড়াশুনা বা গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। মহানবীর (সা) জীবনের শেষ দিনগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি হুগো মহানবী (সা) সম্পর্কে প্রশংসাসূচক কথা বলেছেন এবং বেশ শ্রদ্ধাভরে মহানবীর (সা) নানা গুণ আর বৈশিষ্ট্যও তুলে ধরেছেন তার ওই কবিতায়। হুগো মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)'র ব্যক্তিত্ব ও তাঁর রিসালাতের প্রতি ছিলেন খুব গভীর শ্রদ্ধাশীল।

'হিজরতের নবম বছর' শীর্ষক কবিতাটি শুরু হয়েছে হযরত নূহ নবীর সঙ্গে মহানবীর (সা) তুলনার মধ্যে দিয়ে। কবিতাটি পড়লে মনে হবে যেন হুগো মহানবী (সা)'র আধ্যাত্মিক ও আসমানি প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ ও বিদ্বেষী পশ্চিমা প্রাচ্যবিদরা যুগে যুগে যে অসত্য চিত্র তুলে ধরেছেন সেসব দূর করে এ মহামানবের পবিত্র বৈশিষ্ট্যগুলোই তুলে ধরতে চেয়েছেন। ভিক্টর হুগো লিখেছেন– মনে হয় যেন তিনি ছিলেন নূহ নবীও জানতেন মহাপ্লাবন সৃষ্টিকারী বৃষ্টি সম্পর্কে তিনি ছিলেন সহিষ্ণু বিচারক যখন মানুষেরা তাদের বিবাদগুলো মেটাতে আসত তাঁর কাছে তখন তিনি একজনকে তার বিচারকে মান্য করার ও অন্যজনকে রায় অস্বীকার করার ও উপহাসের জন্য ওঠার সুযোগ দিতেন তার খাবার ছিল খুব সামান্য এবং কখনও ক্ষুধার কষ্টে পেটে বেঁধেছেন পাথর নিজেই দোহন করতেন নিজ ভেড়ার দুধ বিনম মানুষের মত মাটির ওপর সবতেন ও নিজেই নিজ পোশাকে তালি লাগাতেন যদিও তিনি তখন যুবক ছিলেন না তবুও বেশিরভাগ দিনেই রোযা রাখতেন রমযান মাসে যেমনটি রোযাদার ছিলেন।

"La Legende des siecles" বা শতাব্দিগুলোর কিংবদন্তি শীর্ষক কবিতা হুগো নির্বাসিত থাকার সময় ১৮৫৫ থেকে ১৮৭৬ সনের মধ্যে লিখেছিলেন। এ কাব্যের তৃতীয় অধ্যায়ে (যার শিরোনাম হল হিজরতের নবম বছর) তিনি মহানবীর জীবনের শেষের দিনগুলো তুলে ধরেছেন। হুগো মহানবীর (সা) প্রশংসা করে এ কবিতায় লিখেছিলেন:

হে আল্লাহর রাসূল! আপনি জনগণের কাছে দাওয়াত দেয়া মাত্রই বিশ্ব আপনার কথায় ঈমান এনেছিল।

যেদিন আপনার জন্ম হয়েছিল একটি তারকা আকাশে দেখা দেয় এবং পারস্য সাম্রাজ্যেও খসরুর প্রাসাদের তিনটি মিনার বা টাওয়ার ধ্বসে পড়ে! (La Legende des Siecles, IX, Islam) মহানবী (সা) আনুষ্ঠানিকভাবে নবুয়ত লাভের আগেও সব সময়ই গভীর চিন্তা করতেন। তিনি ভাবতেন মহান আল্লাহর নানা নিদর্শন নিয়ে। তিনি দীর্ঘকাল ধরে হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় বসে সৃষ্টি

জগতের নানা রহস্য নিয়ে ভাবতেন। মহানবীর (সা) এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভিক্টর হুগো তার ওই কবিতায় লিখেছেন–

মুহাম্মাদ (সা) যেন বেহেশত দেখেছেন এবং দেখেছেন প্রেম,
ভবিষ্যৎ ও অতীত বেশিরভাগ সময়ই নীরব থাকতেন ও শুনতেন
সবার পরে কথা বলতেন
সব সময় প্রার্থনায় মশগুল থাকতেন।

ভিক্টর হুগোর দৃষ্টিতে মহানবীর (সা) বিনম্রতা ও মহত্ত্বের কারণে কেউ তাঁকে তিরস্কার করত না। যখন তিনি মহল্লার অলি-গলি ও পথ অতিক্রম করতেন তখন সব দিক থেকে পথিকদের সালাম পেতেন তিনি এবং অত্যন্ত দয়াদ্রভাবে জবাব দিতেন মহানবী (সা)। রাসূল (সা) কোনো কোনো সময় ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের স্থলাভিষিক্ত তথা ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি নিযুক্ত করতেন যাতে তাঁরা মহানবীর (সা) আসমানি রেসালাতের আমানতদার হতে পারেন এবং জনগণকে সৌভাগ্যের পথ দেখাতে পারেন। হুগো এ প্রসঙ্গে লিখেছেন–

তিনি ছিলেন শান্ত কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ছিল উচ্চ আকাশের ঈগল পাখির মত যে বাধ্য হয়েছে আকাশ ছেড়ে নেমে আসতে। প্রতিপালকের কাছ থেকে মানুষের জন্য আনা কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করতেন। এরপর ইসলামের পতাকা তিনি তাঁর পতাকাধারী আলীর কাছে ন্যাস্ত করেন এবং বলেন–

'এটাই আমার জীবনের শেষ প্রভাত/ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর পথে জিহাদ কর বা সচেষ্ট থাক!'

সেদিনও তিনি অন্য সব দিনের মতই নামাযের সময় মসজিদে এলেন। তিনি হযরত আলীর দেহের উপর ভর করলেন বা হেলান দিলেন। বিশ্বাসীরা আসছিলেন তাঁর পেছনে। বাতাস বইছিল পবিত্র পতাকাগুলোর মধ্য দিয়ে।

মহানবী (সা) ছিলেন সর্বশেষ রাসূল এবং পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের পথ অব্যাহত রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি এমন এক চেইন বা চক্রের পূর্ণতাদানকারী যে তাঁর নবুয়ত ও রেসালাত মানবজাতির ইতিহাসকে বদলে দিয়েছে। ভিক্টর হুগো তার কবিতায় এ প্রসঙ্গে মহানবীর (সা) হয়ে নিজ বক্তব্য তুলে ধরে বলছেন–

আমি তো আমার মহান আল্লাহর বাণীর একটি বাক্য আমি ছাই, মানুষের রুটির মতন, আমি আগুন, নবীদের মত আমি উত্তাপ-সঞ্চারক ও আলোকদাতা/ ঈসা মাসিহ ছিলেন আমারই ভূমিকা বা পটভূমি ভোরের আলোগুলোর মত যা কিনা সূর্যের সুসংবাদ বয়ে আনে মরিয়মের পুত্র, ছিল প্রশান্ত ও খোশকালামের অধিকারী/ শিশুদের মত ভিক্টর হুগো ওই কবিতায় মহানবীর (সা) বক্তব্য তুলে ধরতে গিয়ে আরো লিখেছেন–

কিন্তু আমি ছিলাম এমন শক্তি যে ঈসার অপরিপূর্ণ নূরকে পরিপূর্ণ করেছিলাম...

আমি সত্য ও ন্যায়ে বড় শেকড়ের অধিকারী ছিলাম তাঁর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য আমার আবির্ভাব কিন্তু ক্ষোভ বা ক্রোধের মাধ্যমে নয়; দয়ার মাধ্যমে একাকি ছিলাম ও এখনও একাই আছি/ নগ্ন ও ক্ষত-বিক্ষত এবং এটাই বেশি ভালোবাসি তাদেরকে অনুমতি দেয়া হত যে আমাকে দমন করার অথচ আমার ডান হাতে ছিল সূর্য ও বাম হাতে চাঁদ ওরা আমার ওপর কাঠোর হামলা চালাল, কিন্তু অবশেষে হল পরাজিত আর আমি এক পাও পিছু হটলাম না।

জীবনের শেষ দিনগুলোতে মহানবী (সা) অসুস্থতা যখন বেড়ে গিয়েছিল তখন তিনি মসজিদে এসে বললেন– আমার কাছে যারই কোনো কিছু পাওনা রয়েছে বা অধিকার রয়েছে সে তা এখন আদায় করুক! উম্মত কেঁদে উঠল ও বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার ওপর আমাদেরও পাওনা বা অধিকার থাকতে পারে? তিনি বললেন– আল্লাহ'র কাছে কলঙ্কিত হওয়া তোমাদের কাছে কলঙ্কিত হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন! আমার কাছ থেকে তোমাদের কিছু পাওনা থাকলে তা এখনই আদায় করে নাও, তা যেন শেষ বিচারের দিন বা কিয়ামত পর্যন্ত না গড়ায়। হুগো মহানবীর জীবন-সায়াহ্নের ঘটনাগুলোয় তাঁর প্রশংসা তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছেন–

যখন নামাযের সময় হল

তিনি মসজিদে যেতে চাইলেন
যদিও সে সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন
আলীর দেহের ওপর ভর করলেন,
লোকেরা অনুসরণ করছিল তাঁকে

পবিত্র পতাকা উড়ছিল বাতাসে যখন মসজিদে পৌঁছলেন দেহ তাঁর কাঁপছিল গায়ের রং যেন উধাও হয়েছিল তিনি লোকদের দিকে ফিরলেন ও বললেন– হে মানুষেরা! দিনের যেমন অবসান ঘটে রাতের আঁধারে মানুষের জীবনও পৌঁছে যায় মৃত্যুর তীরে আমরা সবাই নশ্বর মাটির ও অনুল্লেখযোগ্য কেবল মহান আল্লাহই অবিনশ্বর এবং অদ্বিতীয় একজন হে জনগণ! উস্তুত মানুষ আল্লাহর পথে চলা ছাড়া অপদস্থ ও ঘৃণ্য প্রাণী বড় মাপের এ সময় অনুযোগ করে বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! প্রেরিত পুরুষ! মানুষকে দাওয়াত দেয়া মাত্রই সবাই আপনার আহ্বান শুনেছে পেতে হৃদয়ের কান এবং আপনার বক্তব্যের সত্যতায় বিশ্বাস করেছে স্থাপন যেদিন আপনি এসেছিলেন দুনিয়ায় আকাশ শোভিত হয়েছিল এশটি তারকায় ইরান-সম্রাটের প্রাসাদের তিনটি মিনারের ঘটে পতন... মহানবী নিরব থেকে কিছুক্ষণ নিঃশ্বাসের শক্তি করে নেন নবায়ন অতঃপর আবারও কথা শুরু করে বলেন– এসব সত্ত্বেও সময় হয়েছে বিদায় নেয়ার। জনতার মাঝে শুরু হল গুঞ্জন কলরব:

জীবনের শেষ দিনগুলোতে কারো কাছে দেনা থাকলে তা বুঝে নিতে ও কাউকে কথার মাধ্যমে বা কোনোভাবে শরীরে আঘাত দিয়ে থাকলে তার প্রতিশোধ নিতে মহানবী যে আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই ঘটনাও খুব সুন্দরভাবে কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন ভিক্টর হুগো। ওই একই কবিতায় হুগো এ প্রসঙ্গে লিখেছেন– মহানবী (সা) বলে চললেন:

হে মানুষেরা শোনো পেতে কান!
যদি তোমাদের কাউকে কখনও বলে থাকি অবাঞ্ছিত কোনো কথন
আমি তোমাদের মাঝে থেকে যাবার আগেই দাঁড়াও এখন
সবার সামনে আমাকেও শুনিয়ে দেও তেমনই কথন!
যদি কাউকে দিয়ে থাকি অন্যায্য আঘাত
এসো এই লাঠি নিয়ে করো প্রত্যাঘাত!

এক ব্যক্তি দাবি করেছিলেন যে মহানবীর লাঠি একবার তার পেটে লেগেছিল এবং এখন তিনি প্রতিশোধ নিতে চান! মহানবী তাঁর জামা উপরে তুলে ধরলেন! লোকজন এই লোকটির ব্যাপারে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু লোকটি মহানবীর পায়ে পড়ল ও মহানবীর পেটে চুমো খেয়ে বলল– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার বদন

ছুয়ে আমি নিজেকে দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করছি! হুগো তার কবিতায় এ ঘটনাটিই উল্লেখ করেছেন।

মহানবীর (সা) গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে ভিক্টর হুগো এই মহামানবের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো খুব কোমল ও বেদনাদায়কভাবে নিজের কবিতায় তুলে ধরেছেন। মহানবীর (সা) শেষ উপদেশ ও অসিয়তগুলো সম্পর্কে হুগো তার কবিতায় লিখেছেন–

হে জনগণ! করো মহান আল্লাহয় বিশ্বাস স্থাপন!
মহান আল্লাহর সমীপে মাথা কর অবনমন
মেহমানের নিও যতন!
ভয় করবে আল্লাহকে সর্বক্ষণ!
হয়ো ন্যায়পরায়ণ!
কখনও থেকো না এমন দেয়ালে
যা বেহেশতকে জাহান্নামের পতন-স্থল থেকে রাখে আড়ালে
ভুল থেকে কেউ নয় মুক্ত
তবুও সচেষ্ট থেকো যাতে না হও শাস্তির যোগ্য
এরপর মহানবী হলেন আবারও নিরব কিছুক্ষণ ভাবনায় ডুবে গেলেন
মানুষের দয়ার্দ্র দৃষ্টি তখন তাঁর ওপর যেন দৃষ্টি কবুতরের
এমন একজন প্রজ্জ্বোল মহামানবের দিকে তারা তাকাচ্ছিলেন যিনি ছিলেন নির্ভরতার স্থল সারা জীবন।

মহানবীর (সা) জীবনাবসানের চিত্র হুগোর কবিতায় ফুটে উঠেছে এভাবে–

তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছিল
মৃত্যুর ফেরেশতা এলো ঘরের দরজায়
চাইলো প্রবেশের অনুমতি
মহানবী দিলেন সম্মতি
খোদার কর্মী যখন ঘরে ঢুকলেন
সবাই দেখলেন
মহানবীর চোখে যেন খেলে গেলো
উজ্জ্বল এক বিস্ময়কর বিদ্যুতের চমক!
ঠিক সেই নূরের মত যা জন্মদিনে তাঁর চোখে প্রজ্জ্বোল ছিল
এভাবে মুহাম্মাদের (সা) প্রাণ জীবন-স্রষ্টার কাছে ফিরে গেল।♦

পারভিন এতেসামি

সমকালীন ইরানের প্রগতি ও মানবতার কবি

ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন

মেহজাবিন ইসলাম

আধুনিক ইরানি সাহিত্যাকাশে এক ক্ষণজন্মা, সফল ও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের নাম পারভিন এতেসামি; মাত্র ৩৫ বছরের (১৯০৬-১৯৪১ খ্রি.) সীমিত আয়ুষ্কালে যিনি তাঁর বিচিত্র জীবন ও কাব্যচর্চার মাধ্যমে নিজেকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। পারভিন এতেসামি ইরানের রক্ষণশীল সমাজে বেড়ে উঠলেও তিনি নিজেকে প্রগতির কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় সফলতা

হলো, তিনি নারী জাগরণের কবি, সর্বোতভাবে তিনি আর্তমানবতার কবি। রক্ষণশীলতার দেয়াল ভেঙ্গে প্রগতির সৌধ নির্মাণ, হতাশা-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের দুঃখ-মোচন, বর্বরতা-পাশবিকতার মূলোৎপাটন করে মানবিক সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করা, সংকীর্ণতা-কুপমুণ্ডকতার অবসান ঘটিয়ে উদারনৈতিক ও বৃহৎ হৃদয়ের আবাস গড়া, হিংস্রতা-নিষ্ঠুরতার শিকল ছিন্ন করে প্রেম ও ভালোবাসার এক স্বর্গরাজ্য স্থাপন, বঞ্চিত-অবহেলিত মানবসকলের হাহাকার দূরীকরণ ও বিবাদ-বৈষম্যহীন এক বাসযোগ্য পৃথিবীর স্বপ্ন বুনন– ইত্যাকার বিষয় তাঁর কবিতায় বারংবার আগমনে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

ক্ষণজন্মা পারভিন এতেসামি আমৃত্যু ছিলেন সত্যপথের অবিরাম যাত্রী, সত্যের পূজারী। সত্য বলা, সত্যের সাথে থাকা ও সত্যকে ধারণ করা ছিল তাঁর জীবনের মিশন; সেই সত্যপথের স্পষ্ট বয়ানের প্রতিধ্বনি হয়েছে তাঁর কবিতায়। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী, কাজ করতেন বেশি কিন্তু কথা বলতেন কম; নিজেকে জাহির করার কোনো প্রবণতা তাঁর মাঝে বাসা বাঁধেনি। প্রচারবিমূখতা তাঁর আরেক অনবদ্য গুণ; কখনোই নিজের কোনো বৈশিষ্ট্য প্রচার-প্রসারে মনযোগ দেননি। কর্মক্ষেত্রে সাহসের প্রতীক হিসেবে ধরা দিয়েছিলেন, সকল প্রতিকূলতাকে অসম সাহসের দ্বারা মোকাবেলা করেছেন। পারিবারিক ঐতিহ্য, মূল্যবোধের শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এক্ষেত্রে তাঁকে সহযোগিতা করেছে। সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, অবিচলতা, কর্মে দৃঢ়চেতা আর আন্তরিক প্রয়াসে নিজেকে এক নিবেদিতপ্রাণ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিলেন। শিক্ষকতার মহান পেশা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করে নিরলস কাব্যচর্চার মাধ্যমে নিজের পেশাদারিত্বকে শাণিত করেছিলেন।

মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ পাশাপাশি অবস্থান করে থাকে। পারভিনের জীবনে সুখের ইতিহাস কখনোই দীর্ঘ হয়নি বা স্থায়িত্ব পায়নি। সুখের আশায় বাঁধা দাম্পত্য পরিসর অল্পকালের ব্যবধানেই তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভরে যায়। ফলে আর সংসার করা তাঁর হয়ে ওঠেনি। ব্যক্তিগত জীবনে সুখ-বিচ্ছেদের এই অনল নির্বাপিত হতে না হতেই আরেক অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন পারভিন। নিজের আদর্শ পিতাকে হারাবার পীড়াদায়ক বেদনাও তাঁকে সইতে হয়; এমনকি সবশেষে তিনি নিজেও অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তবে যন্ত্রণা ও বেদনাবিধুর এই জীবনে তিনি অনেক কীর্তিমান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য ও সাহচর্য পেয়েছিলেন। অগ্রজ কবি-সাহিত্যিকদের প্রভাবও তাঁকে কাব্য রচনার ক্ষেত্রে এক বিশেষ যোগ্যতায় উপনীত করেছিল। সেই প্রভাবের ফলশ্রুতিতেই তাঁর কবিতার বিশাল অংশজুড়ে মানবতার জয়গান প্রতিফলিত হয়েছে এবং আধ্যাত্মিকতার অবতারণ ঘটেছে।

এছাড়া অপরাপর নানা বৈশিষ্ট্য তো আছেই। তাঁর সমসাময়িক ও অনুজ কবি-সাহিত্যিকেরাও তাঁকে সমানভাবেই মূল্যায়ন করেছেন। ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অধিকারী হিসেবে বাংলাদেশেও সাহিত্যামোদী মহলের নিকট পারভিন এতেসামির কদর রয়েছে।

ফারসি সাহিত্যে আধুনিক মনন ও ভাবধারা আনয়নে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তাঁদের মধ্যে মালেকুশ শোয়ারা বাহার (১৮৮৬-১৯৫১ খ্রি.), আদিবুল মামালিক ফারাহানি (১৮৬০-১৯১৭ খ্রি.), ইরাজ মির্জা (১৮৭৪-১৯২৬ খ্রি.), আরেফ কাযভিনি (১৮৮১-১৯৩৪ খ্রি.), আলি আকবর দেহখোদা (১৮৭৯-১৯৫৬ খ্রি.) ও পারভিন এতেসামি (১৯০৬-১৯৪১ খ্রি.) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

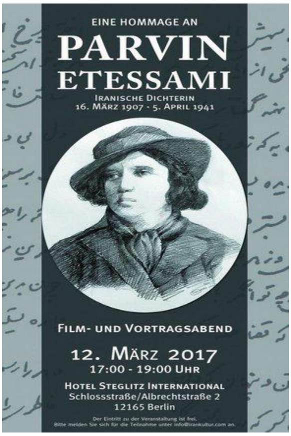

পারভিন এতেসামি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম সারির খ্যাতিমান কবিদের অন্যতম, যাঁকে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান পুরুষ কবিদের সাথে তুলনা করা হয়। সমসাময়িক সাহিত্যবোদ্ধা ও বিশেষজ্ঞগণের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি ফারসি সাহিত্যের অগ্রগণ্য কবিদের বাচনভঙ্গিকে তাঁদের রচনাবলি থেকে আত্মস্থ করেছেন। আধুনিক কবি পারভিন এতেসামি এমনই একজন সৃজনশীল কবি, যিনি তাঁর কাব্যে জীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যাকে অবলম্বন করে অভূতপূর্ব যুক্তিশীলতার দ্বারা আর্তদরদি মনের গোপন ব্যথা শৈল্পিকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন এবং প্রেম ও মানবতার বাণী নিয়ে নির্যাতিত, অসহায় সমাজে আশার ও বাঁচার আলো প্রজ্বলন করেছেন।

পারভিন এতেসামির আবির্ভাব ঘটে মূলত ইরানের এক রক্ষণশীল সমাজে। যে সমাজের সর্বত্রই ভয়, আতঙ্ক, হিংস্রতা, সহিংসতা, মিথ্যা, প্রতারণা,

অমানবিকতা ও বৈষম্যের ভয়াবহতা বিরাজমান ছিল। আর এ কারণেই পারভিনের কবিতা নিরন্তর ছুটে বেড়ায় নির্যাতিত, ব্যথিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের মনের দোয়ারে। দুঃখ ভারাক্রান্ত মানুষ সুখের সন্ধান খুঁজে পায় তাঁর কবিতায়। এভাবেই পারভিন তাঁর কবিতার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত মানুষের অন্তরের গহীন ব্যথার অনুসন্ধান করেছেন এবং মনের ভেতর থেকে আত্মবিশ্বাসের স্ফুরণ ঘটিয়ে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের চূড়ায় আরোহণের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করেছেন। তিনি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন নিষ্ঠুরতার কালো দেয়াল ঘেরা বিপর্যস্ত ও সহিংস সমাজব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য এবং একইসাথে নির্মাণ করতে বলেছেন মানবিকতা ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ সহনশীল, শোষণমুক্ত ও বন্ধুত্বপূর্ণ সমাজব্যবস্থা।

ফারসি সাহিত্য, মানবিক মূল্যবোধ, নারী জাগরণ ও ইরানি নারী সাহিত্যিকের ইতিহাসে পারভিনের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ঘটনা। পারভিন ছিলেন নারী প্রগতি ও নারীবান্ধব পরিবেশের স্বপ্নদ্রষ্টা। পারভিন স্বপ্ন দেখতেন পুরুষ শাসিত এ বিশ্বে নারী তার যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, নারী ও পুরুষের সমঅধিকারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজব্যবস্থাই মানবজাতির জন্য মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর বার্তা বয়ে আনবে। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা ছিল অবহেলিত, পশ্চাৎপদ, মানবিক বৈষম্যের শিকার নারী তথা মানবসমাজের সর্বাঙ্গীন মুক্তি। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন নারী জাগরণের অগ্রদূত, অন্যদিকে ছিলেন হাজারো বৈষম্যের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। আলোর দিশারী পারভিন অন্ধকারে নিমজ্জমান নারী সমাজকে মুক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত করে আলোর সন্ধান দিয়েছেন। নারী শিক্ষায় অনুপ্রেরণা দান ও সম্প্রসারণ এবং নারী অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পারভিনের সাহসী ও অগ্রণী ভূমিকা চিরস্মরণীয়। নারীর অধিকার সংগ্রামের ইতিহাসে পারভিনের অবদান পর্যালোচনার জন্য তাঁর কর্মময় জীবন, সমাজচিন্তা, পারিবারিক পরিবেশ, যুগধর্ম ও সাহিত্য সাধনার তাৎপর্য অনুধাবন করা অত্যাবশ্যকীয়।

জীবন ও সমাজ কাঠামোর ভেতরকার বৈষম্যের বীজ দূরীভূত করা, অসুস্থ ও অন্ধকার সমাজব্যবস্থাকে সুস্থ ও আলোকিত করে তোলা, প্রতারণামূলক সমাজের মুখোশ উন্মোচন করা, ভ্রান্ত বিশ্বাসের শিকড়কে উপরে ফেলে ধসে পড়া বন্ধু ভাবাপন্ন অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করে তোলাই হল পারভিনের কবিতার মর্মবাণী। তাঁর কবিতার মর্মস্পর্শী ছত্র সাধারণ মানুষের দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। পারভিনের কবিতা তাঁর গহীন মনের চলমান সংগ্রামকে উপলব্ধি করতে আমাদের সহায়তা করে। স্বীয় কবিতার মাধ্যমে তাঁর প্রতিবাদ সবধরনের বৈষম্য, অমানবিকতা, অসভ্যতা, অসুন্দর, উগ্রতা ও অকল্যাণের

বিরুদ্ধে। তাঁর কাব্যে একদিকে যেমন সমাজের অনুদারতা ও কূপমণ্ডুকতার বিস্তৃত সমালোচনা আছে তেমনি তীব্র বেদনাবোধ ও মুক্তির ব্যাকুল বাসনাও রয়েছে। ভাষার সহজ-সরল প্রাঞ্জলতা, প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্টতা, ক্ষুরধার রম্য ও ব্যঙ্গরীতির স্বাতন্ত্র্য তাঁর কাব্য নৈপুণ্যের পরিচায়ক। আধুনিককালের কবি পারভিন একদিকে যেমন ধর্মীয় গোঁড়ামী, কূপমণ্ডুকতা, অন্যায়, অত্যাচার ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছিলেন প্রতিবাদী এক কণ্ঠস্বর; অপরদিকে তাঁর মধ্যে প্রতিনিয়ত এক উন্নত মানবিক জীবনের সুর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতো। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, সংগ্রাম ও সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁর রচিত প্রেরণাদায়ক ও মাধুর্যময় কবিতা সকলের হৃদয়ে তাঁকে চিরন্তন আসনে ঠাঁই করে দিয়েছে।

আধুনিক সংস্কৃতিমনস্ক কবি পারভিন এতেসামি শৈশব থেকেই কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। শৈশবেই সাহিত্যপ্রেমী বাবার সহযোগিতায় তৎকালীন সময়ের স্বনামধন্য কবি-সাহিত্যিকদের বিখ্যাত সাহিত্যকর্মের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। এছাড়া তিনি নিজ বাসায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য আসরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে এবং তা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে কাব্যচর্চা অব্যাহত রাখেন। পারভিনের সমসাময়িক সময়ে রক্ষণশীল ও প্রগতি-বিরুদ্ধ সমাজের সাহিত্যজগতে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল অপ্রতুল। একদিকে যুগের বিপরীতে তাঁর আধুনিক চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অপরদিকে তাঁর অর্থবহুল, যুগোপযোগী, সত্যানুসন্ধানী, সাহসিকতাপূর্ণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর কবিতাগুলো সাধারণ পাঠককে ভাবিয়ে তোলে তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে। তাদের ধারণা জন্মেছিল এসব কবিতা পারভিনের অর্থাৎ কোনো নারীর রচিত হতে পারে না। মূলত এ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পারভিনের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর কবিতা সম্বন্ধে সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করত। এমনকি অনেকে আবার তাঁকে কৌতূহলবশত পুরুষ

বলেও ধারণা করত। পারভিন নিজেই এসব ভ্রান্ত ধারণা, কৌতূহল ও রহস্যের জাল উন্মোচন করে এর প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেন–

জ্ঞানীদের একটি দল কি করে পারভিনকে পুরুষ ভাবে
এ রহস্যের জট খোলাই উত্তম যে পারভিন পুরুষ নয়।
হে বন্ধু! তোমার যতটুকু সাধ্য আছে, তদনুযায়ী প্রত্যাশীদের বাসনা পূর্ণ করো
প্রার্থীদের হৃদয়ে উঁকি দেয়া, অভাব-মোচন সম্পদশালীদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ
প্রথমে তুমি তোমার চোখের জ্যোতি অর্জন করো, অতঃপর সেই জ্যোতিতে অন্ধকার পথে যাত্রা করো
পারভিন, কঠিনতম বিপদাপদের দিনগুলো এভাবেই ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে মোকাবিলা করো।

নারীবাদী, মানবতাবাদী ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠের ধারক পারভিন এতেসামি ছিলেন সৎ স্বভাব সম্পন্ন, পবিত্র চিন্তাধারা ও মার্জিত স্বভাবের অধিকারী, সচ্চরিত্রা, সদাচারিণী, বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে বিনীত এবং সততা ও ভালোবাসার পথে অবিচল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অত্যন্ত মাধুর্যপূর্ণ ও নান্দনিক সৌন্দর্যে ভরপুর। নির্জনতা প্রিয় কবির চিন্তা-চেতনা ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ। পারভিন শৈশব থেকেই অত্যন্ত অধ্যবসায়ী ও চিন্তাশীল ছিলেন এবং জীবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন নিঃষঙ্গতা, নির্জনতা ও নিমগ্নতায়। অল্পভাষী পারভিন খুব কমই সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদের সাথে খেলাধুলা, হাসি-ঠাট্টা, হৈ-হুল্লোড় ও আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠতেন।

নৈতিকতা প্রিয়, স্পষ্টবাদী ও মানবতার পূজারী কবি পারভিন সর্বদা সত্য ও সুন্দরের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। সত্য ও সুন্দরকে অবলম্বন করেই তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়েছে। তাই সত্য প্রকাশের গুরুত্ব অনুধাবন করে নির্ভীক পারভিন সকলকে সত্য প্রকাশে ও সত্যবাদী হতে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর ভাষায়–

সত্যবাদী হও হে পারভিন, কিসের ভয়?
মিথ্যার কারণে সত্য গোপন উচিত নয়
কথার সময় ভয় পেও না, যা বলার বলে যাও
কেননা যুদ্ধের দিনে খাপবদ্ধ তরবারি দেখতে বড়ই কদাকার।

পারভিন বিশ্বাস করতেন সত্যবাদী মানুষকে অবশ্যই সাহসী হতে হবে। কেননা পর্যাপ্ত সাহসের অভাবে উপযুক্ত সময়ে সত্য প্রকাশ না পেলে অসত্য সত্য ও সুন্দরকে গ্রাস করে নিবে এবং এর ফলে কল্যাণময়ী, নৈতিকতাপূর্ণ সুন্দর এ সমাজব্যবস্থা নৈতিকতা বিবর্জিত, অসুন্দর ও অসত্যের চাদরে ঢাকা পড়বে– যা পরবর্তীতে মানবজীবনে নৈতিক অবক্ষয় ডেকে আনবে। মানবতার কবি পারভিন উপরোক্ত কবিতার মাধ্যমে এ ভয়াবহতার প্রকাশ ঘটিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেছেন।

কবি পারভিনের চরিত্রে সরলতা, ভদ্রতা, উদারতা, নৈতিকতা, সত্যভাষণ, বিনম্রতা ও ধৈর্যশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বল্পভাষী ও চিন্তাশীল পারভিন সর্বদা সকলের সাথে সুন্দর ব্যবহারের প্রতি সজাগ ও সচেতন দৃষ্টি রাখতেন। নিরহংকার ও প্রচারবিমুখ পারভিন কখনো নিজের চরিত্র ও সাহিত্যচর্চার গুণ-গরিমার কথা মুখে উচ্চারণও করতেন না। এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো তাঁর পাঁচ হাজারের অধিক বেইত সম্বলিত দিওয়ান বা কাব্যগ্রন্থ যেখানে মাত্র দু'একটি জায়গায় প্রয়োজনীয় অবস্থার প্রেক্ষাপটে নিজের সম্বন্ধে বলেছেন বা কবিতা রচনা করেছেন। এছাড়া দরবারের শিক্ষকতা গ্রহণে ও ইরান সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় প্রদত্ত সম্মাননা পুরস্কার লিয়াকত গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন স্বাধীনচেতা কবির বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সম্ভ্রমবোধ, উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি, সাহসিকতা ও বিনয়ের প্রমাণ বহন করে। তাঁর এ অমায়িক ব্যবহার ও চরিত্রের কারণে সর্বশ্রেণীর মানুষের নিকট তিনি প্রিয়ভাজন ও সম্মানিত হয়ে উঠেন।

মির্জা ইউসুফ পারভিনের কৈশোর ও যৌবনকালীন সময়ে 'বাহার' পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। প্রথমবারের মতো তিনি মেয়ের কবিতাসমূহকেও এ পত্রিকায় সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। তাঁর যে সকল লেখা পত্রিকায় ছাপা হতো তা যেন কোনো কলম সৈনিকের লেখা, যার মধ্যে ফারসি ভাষার গভীরতর সৌন্দর্য প্রকাশমান। এ সকল লেখার মধ্যে তিনি আরবি ভাষার যে অনুপম প্রয়োগ ঘটাতেন তা ফারসি ভাষার সাথে অতীব সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এছাড়া সাহিত্য অনুরাগী পারভিনকে যে বিষয়টি কবিতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি ও তাঁর কাব্য প্রতিভা শক্তিশালী করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তা হচ্ছে

তৎকালীন সাহিত্য সভাগুলোতে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত। কারণ তাঁর পিতার সাথে তৎকালীন সাহিত্যিক মহলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কখনো কখনো তাঁদের বাসাতেই সাহিত্যিক জলসা বসত। সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা হতো। এক ভিন্ন ধারার সাহিত্যিক আমেজ বিরাজ করত সেখানে। যেখানে খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক, পণ্ডিত, জ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী প্রমুখ ব্যক্তি অংশগ্রহণ করতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আলি আকবর দেহখোদা, মালেকুশ শোয়ারায়ে বাহার, আব্বাস ইকবাল আশতিয়ানি, সাঈদ নাফিসি, নাসির উল্লাহ তাকভিসহ বহু প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিক। পারভিন তাঁর পিতার কাছে নিয়মিত যাতায়াতকারী এ সমস্ত জ্ঞানী-গুণী ও বিশিষ্ট পণ্ডিতের উপস্থিতি থেকে একদিকে নিজেকে যেমন সমৃদ্ধ করেছিলেন, অন্যদিকে সভায় সানন্দচিত্তে স্বরচিত কবিতা পাঠের মাধ্যমে স্বকীয় প্রবল সহজাত কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়ে তাঁর মাঝে থাকা অসাধারণ যোগ্যতা প্রকাশের মাধ্যমে তাঁদেরকে বিস্ময়ে অভিভূত করতেন।

তাছাড়া শৈশবেই পারভিন ফেরদৌসি, নিজামি, মৌলাভি, নাসের খসরু, মনুচেহেরি, আনওয়ারি, ফররুখি, সাদি, হাফিজ প্রমুখ জগৎবিখ্যাত কবির সাহিত্যকর্ম বিশেষ করে তাঁদের দিওয়ান অধ্যয়ন করেন এবং পিতার নির্দেশে পূর্ববর্তী এসব কবির কবিতা থেকে ভাব গ্রহণ করে কখনো ছন্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে আবার কখনো স্বতন্ত্র অন্ত্যমিল সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন নতুন কবিতা রচনা করেন। এভাবেই স্বনামধন্য ফারসি প্রগতি ও মানবতার অন্তর্মুখী কবি পারভিন এতেসামির কাব্যচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে পারভিনের কবি হয়ে উঠার পেছনে তাঁর শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনা, উদার, সহায়ক, সৃজনশীল ও ইতিবাচক পারিবারিক পরিবেশ এবং বিশেষ করে কুসংস্কারমুক্ত ও শিক্ষানুরাগী পিতা ইউসুফ এতেসামির প্রেরণা ও প্রচেষ্টা মূখ্য ভূমিকা পালন করে।♦

ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন : অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মেহজাবিন ইসলাম : এমফিল গবেষক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

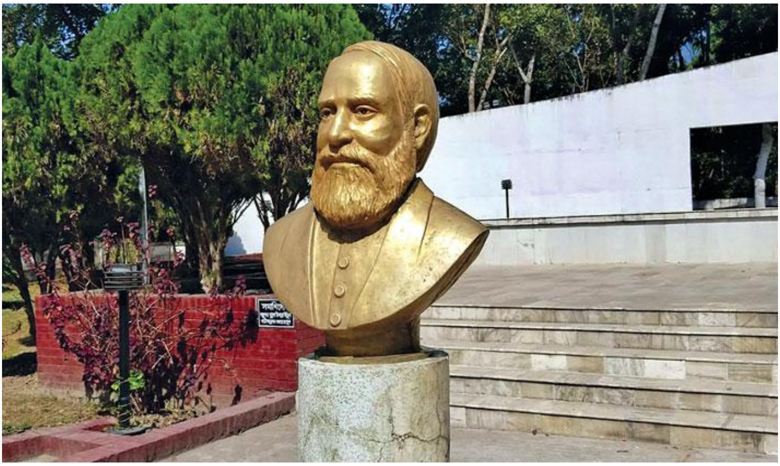

মীর মশাররফ হোসেন– জন্ম : ১৩ নভেম্বর ১৮৪৭, মৃত্যু : ১৯ ডিসেম্বর ১৯১১

ঊনবিংশ শতকের প্রেক্ষাপট ও মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য সাধনা

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

বাংলায় মুসলিম শাসনামলের (১২০৪-১৭৫৭) সাড়ে পাঁচ'শ বছর নানাদিক থেকে 'স্বর্ণযুগ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ সময় রাজনৈতিক-সামাজিক শৃংখলা বজায় থাকার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও ধর্মীয়ভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এ সময় বাংলার খ্যাতি বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শাসকগোষ্ঠী উদারভাবে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। মুসলিম শাসকগোষ্ঠী এবং সমাজের বিত্তবানগণ স্বেচ্ছায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন ও বিনা খরচে সেখানে ছাত্রদের থাকা-খাওয়া ও পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। এ কারণে বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

কিন্তু ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে বাংলার ভাগ্য-বিপর্যয়ের ফলে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ভাষার ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় ঘটে। ইংরাজ শাসক ও তাদের দোসর হিন্দু জমিদার-জোতদার-গোমস্তা-কর্মচারী ও

পাইক-বরকন্দাজদের শোষণ-জুলুম-অত্যাচারে বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে আসে এবং বাংলা ভাষা-সাহিত্যের চর্চা ব্যাহত হয়। এতদিন পর্যন্ত শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর লোকদের আশ্রয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কবি-শিল্পীগণ সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদির চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর এবং বেনিয়া ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের পর স্বাভাবিকভাবে বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা সামগ্রিক ক্ষেত্রে সমূহ বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। কবি-সাহিত্যিক ও বিদগ্ধ সংস্কৃতিসেবীগণ অকস্মাৎ পৃষ্ঠপোষকহীন, অসহায়, ছিন্নমূল মানুষে পরিণত হন। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ও অনিশ্চয়তার কারণে মানুষের মনে সদা সশংক ভাব বিরাজ করে। এ পরিবর্তিত অবস্থায় মানুষের মানস-রাজ্য নিতান্তই অভিব্যক্তিহীন, ফ্যাকাশে ও সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। জনগণ সর্বদা ইংরেজ ও তাদের এদেশীয় অনুচরদের নানারূপ অত্যাচার, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক পীড়ন ও জুলুমের আশংকায় সদা চিন্তান্বিত থাকে। এরূপ উদ্বেগাকুল পরিবেশ সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার উপযোগী নয়। তাই দেখা যায়, ইংরেজ আমলে প্রথম প্রায় এক শতাব্দীকাল তেমন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। সাধারণ মানুষের মধ্যে আউল-বাউল-দেহতত্ত্ব-মারফতী জাতীয় কিছু গান-কবিতা ইত্যাদি রচিত হয়েছে। সেগুলোকে উঁচুমানের সাহিত্য বলা যায় না।

ইংরেজগণ প্রথম ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে আগমন করে। কিন্তু অর্থ-লিপ্সা ক্রমে রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত হয়। এদেশীয় বিশ্বাসঘাতক স্বার্থপর কিছু ব্যক্তি তাদের এ উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সাহায্য করে। এভাবে বেনিয়া শ্রেণীর ইংরেজগণ যখন তাদের এদেশীয় অনুচরদের সহযোগিতায় ছলে-বলে-কৌশলে রাজনৈতিক আধিপত্য লাভে সক্ষম হয়, তখন তাদের থেকে কল্যাণ-বুদ্ধিসম্পন্ন কোন সুশাসন প্রত্যাশা করা ছিল দুরাশা মাত্র। ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজগণ নবলব্ধ রাজশক্তিকে অর্থনৈতিক শোষণের নিষ্ঠুর যন্ত্রে পরিণত করে। এরূপ পরিবেশে জনগণের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সুকুমার বৃত্তির চর্চা ও বিকাশ সম্ভব ছিল না। ক্ষমতা দখলের প্রায় অর্ধশত বছর পর তারা উপলব্ধি করে যে, রাজনৈতিক আধিপত্য স্থায়ী করতে হলে এদেশের মানুষকে মানসিক দিক দিয়ে তাদের গোলামে পরিণত করতে হবে। ফলে তারা এদেশে একশ্রেণীর রাজানুগত লোক তৈরির উদ্দেশ্যে ইংরেজি ভাষা ও শিক্ষা-পদ্ধতি চালু করে তার দ্বারা ইংরেজি ভাষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটাবার প্রয়াস পায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা খৃস্টান ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে এদেশে তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থকে স্থায়ী

করার চেষ্টা চালায়। এদেশের মানুষকে পাশ্চাত্যের মত জ্ঞানী-গুণী-শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে তারা ইংরেজি ভাষা ও শিক্ষা-পদ্ধতি চালু করেনি; বরং এদেশীয় একশ্রেণীর মানুষকে তাদের অনুগত গোলামে পরিণত করাই এর লক্ষ্য ছিল। এসব অনুগত গোলামদের মাধ্যমে এদেশে ইংরেজদের শাসন ও শোষণ-যন্ত্রকে মজবুত করা ও রাজনৈতিক গোলামীর সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা-মনন ও সংস্কৃতির দিক থেকেও এদেশীয় মানুষের মধ্যে হীনম্মন্যতা ও দাসত্ব সৃষ্টি করাই ছিল এর লক্ষ্য। ইংরেজদের এ লক্ষ্য সম্পর্কে তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি:

"বর্তমানে আমাদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে, সমাজে যারা শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। তারা রক্ত-মাংসের গড়নে ও বর্ণে ভারতীয় হবে বটে, কিন্তু রুচি-চিন্তা ও মননের দিক দিয়ে হবে খাঁটি ইংরাজ। (Woodrow: Macaulay's Minutes on Education in India-1862)।

এ নব্য শিক্ষা-সভ্যতা প্রচলনের ফলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেলেও সাধারণ জনগণ বিশেষত বাঙালি মুসলিম সমাজ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। পলাশীর বিপর্যয় বাঙালি হিন্দুদের নিকট ছিল শুধুমাত্র প্রভু বদল। তাদের মধ্যে একশ্রেণীর অতি স্বার্থপর লোক এ পরিবর্তন আগে থেকেই প্রত্যাশা করে আসছিল। বরং এ পরিবর্তন সাধনের ষড়যন্ত্রে তারা

সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। তাই তাদের নিকট এটা একান্ত অপ্রত্যাশিত ছিল না। বরং এটাকে রাতারাতি ভাগ্য বদলের সুযোগ হিসাবে গ্রহণে তারা রীতিমত তৎপর হয়ে ওঠে। ফলে নতুন প্রবর্তিত শিক্ষা-সভ্যতা অনুসরণ-অনুকরণেও তারা দ্রুত এগিয়ে আসে। কিন্তু এ পথে অগ্রসর হতে যুক্তিসঙ্গত কারণেই বাঙালি মুসলিম সমাজের দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়। এ সম্পর্কে ইংরেজ লেখক ইউলিয়াম হান্টার বলেন:

'আমাদের প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা হিন্দুদেরকে শতাব্দীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে তাদের নিষ্ক্রিয় জনসাধারণকে মহৎ জাতিগত প্রেরণায় উজ্জীবিত করে তুলতে পারলেও তা মুসলমানদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী, তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং তাদের ধর্মের কাছে ঘৃণার্হ। ... আমাদের প্রবর্তিত জনশিক্ষা ব্যবস্থা যেমন তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি, তেমনি তাদের নিজস্ব ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য যে আর্থিক সাহায্য এতকাল তারা পেয়ে এসেছিল, তাও আমরা বিনষ্ট করেছি।' (ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান', পৃ. ১৫৪,১৬০)।

ইউরোপীয় শিক্ষা-সভ্যতা আমদানির সাথে সাথে রাজভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও ইংরেজি ভাষা চালু হয়। এতদিন পর্যন্ত রাজ-ভাষা ছিল ফারসি এবং সাহিত্যের ভাষা ছিল বাংলা বা আরবি-ফারসি মিশ্রিত বাংলা। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই এ আরবি-ফারসি মিশ্রিত বাংলা ভাষায় কথা বলতেন ও সাহিত্য চর্চা করতেন। তুলনামূলকভাবে মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষায় যদিও আরবি-উর্দু-ফারসি শব্দের পরিমাণ একটু বেশি ছিল। কারণ মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন আরবি ভাষায় লেখা এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় পরিভাষা হিসাবে তারা অসংখ্য আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। তবু হিন্দুদের ব্যবহৃত ভাষায়ও আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার কম নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ভারতচন্দ্রের সুবিখ্যাত 'অন্নদা মঙ্গল' তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইংরেজ আমলে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত বাংলার পরিবর্তে ফোর্ট উইলিয়মীয় সংস্কৃত বাংলা তথা 'সাধু বাংলা' চালু হয়। পরবর্তীতে ১৮৩৭ সালে রাজভাষা হিসাবে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি প্রচলনের ফলে সকল বাঙালি এবং বিশেষভাবে বাঙালি মুসলমানের সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়। সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে চরম বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। অবশ্য হিন্দু সমাজে এ বন্ধ্যাত্ব দীর্ঘস্থায়ী না হলেও মুসলিম সমাজে নানা কারণে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ প্রসঙ্গে ডক্টর ওয়াকিল আহমদ বলেন:

'বস্তুত ১৯৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ে রাজক্ষমতা-চ্যুতি, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারির সংখ্যা হ্রাস, ১৮২৮ সালে বাজেয়াপ্ত আইনে নিষ্কর ভূমির রায়তি স্বত্ব লোপ, ১৮৩৭ সালে ফারসীর রাজভাষা চ্যুতি-পর পর এই চারটি বড় আঘাতে পূর্বের শাসক শ্রেণী নিঃস্ব-রিক্ত, নিরক্ষর, নিষ্ক্রিয়, নির্জীব জাতিতে

পরিণত হয়। ইংরাজদের প্রশাসনিক আইন ও শিক্ষানীতির ফলেই এই রূপটি হয়েছে।' (ড. ওয়াকিল আহমদঃ ঊনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা, প্রথম খন্ড, পৃ. ৪১)।

নিজস্ব গৌরবময় ঐতিহ্য, রাজ্য-হারানোর বেদনা ও বিগত দীর্ঘস্থায়ী ক্রুসেডের (মুসলমানদের সাথে খৃস্টানদের কয়েক শতাব্দীব্যাপী ধর্মযুদ্ধ) তিক্ততার কারণে ফিরিঙ্গি শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ভাষাকে মুসলমানগণ কিছুতেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এদিক দিয়ে হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের পার্থক্য ছিল স্পষ্ট। ইংরেজদের আগমনের ফলে হিন্দুদেরকে কিছু হারাতে হয়নি। শাসন-ক্ষমতা মুসলমানদের নিকট থেকে ইংরেজদের হাতে চলে যাওয়ায় প্রত্যক্ষভাবে তাদের কোন ক্ষতি হয়নি। বরং মুসলমানদের তুলনায় তারা সহজে ইংরেজদের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়ায় অত্যল্পকালের মধ্যেই তারা ইংরেজদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয় এবং প্রশাসন, সেনাবাহিনী, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারী-জোতদারী ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্থলাভিষিক্ত হয়। ফলে একটি মুসলিম-প্রাধান্যপূর্ণ সমাজ অতি দ্রুত হিন্দু-প্রাধান্যপূর্ণ সমাজে পরিণত হয়। ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রেও তারা দ্রুত অগ্রসর হয়। এ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন:

'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাতে বৃহত্তর জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা অগ্রসর হলো, অর্থনৈতিক বিচারে তাদের নাম মধ্যবিত্ত শ্রেণী, রাষ্ট্রনৈতিক বিচারে তাদের নাম বৃটিশের সহযোগী, সাংস্কৃতিক বিচারে তাদের নাম পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণী, সামাজিক বিচারে তাদের নাম হিন্দু সম্প্রদায়।' (সুরঞ্জিত দাশগুপ্ত ঃ ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃ. ১৬৯)।

সুরঞ্জিত দাশগুপ্ত তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করে লিখেছেনঃ 'বৃটিশের সৌভাগ্য গড়ে তোলার কাজে তিন প্রকার দেশীয় মানুষ সামর্থ্য ও সাহায্য যুগিয়েছে : পাইক সম্প্রদায়-এরা বৃটিশদের বাহুবল যুগিয়েছে; করণ সম্প্রদায় ও তৃতীয় এক ধরনের বিত্তবান সম্প্রদায়... এরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এ দেশীয় বাণিজ্য পরিচালনার ব্যাপারে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেছে। লক্ষণীয় যে, ধর্মের বিচারে বৃটিশদের সামর্থ্য ও সাহায্য যোগানদার এই তিন সম্প্রদায়ই হিন্দু ধর্মাবলম্বী।'

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থতা বরণের পর থেকে মুসলিম সমাজের অনেকে ইংরাজদের প্রবর্তিত শিক্ষা-দীক্ষা অনুসরণে উদ্যোগী হন। ইতঃমধ্যে পুরো এক শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হয় এবং ততদিনে শিক্ষা-সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে

মুসলিমদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি অনেক দেরিতে মুসলিমদের আগ্রহ দেখা গেলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের সামনে অনেক অন্তরায় ছিল। ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা মুসলিমদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক জীবনধারা বিকাশের উপযোগী ছিল না। এ সম্পর্কে উইলিয়াম হান্টার বলেন: 'আমাদের প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা হিন্দুদেরকে শতাব্দীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে তাদের নিষ্ক্রিয় জনসাধারণকে মহৎ জাতিগত প্রেরণায় উজ্জীবিত করে তুলতে পারলেও তা মুসলমানদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী, তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং তাদের কাছে ঘৃণার্হ।' (ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার : দি ইন্ডিয়ান মুসলমান, পৃ. ১৫৪)।

এ কারণেই পরবর্তীকালে মুসলিমদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থা নামে অন্য একটি শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করা হয়। তবে এটা সমস্যার কোন সঠিক সমাধান ছিল না। মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থায় সীমিত অর্থে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও উক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থায় উচ্চতম ডিগ্রি হাসিলের পরও যথাযথ সামাজিক স্বীকৃতি লাভ সম্ভব ছিল না; অর্থাৎ সরকারী চাকরী লাভ বা সামাজিক কোন দায়িত্ব পালন বা কোনরূপ উৎপাদনমুখী ভূমিকা পালনের যোগ্যতা সৃষ্টি হতো না বা সেসব ক্ষেত্রে তাদেরকে কোন রূপ সুযোগ দেয়া হতো না। মক্তব-মাদ্রাসায় শিক্ষকতা অথবা মসজিদের ইমামতী ব্যতীত অন্য কোন পেশায় নিয়োজিত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। তাই সরকারী চাকুরি লাভ ও সামাজিক স্বীকৃতি লাভের আশায় কিছুসংখ্যক মুসলিম ইংরেজি শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হয়। এভাবে মুসলিমগণ মূলত ত্রিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।

ঊনবিংশ শতকের শুরুতেই সামাজিক অস্থিরতা ও মানসিক বৈরাগ্য ও দৈন্য ভাব বিদূরিত হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু সে লক্ষণ কেবল মাত্র বাঙালি হিন্দু সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কলকাতায় ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার ফলে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত হিন্দুগণ বিদ্যাশিক্ষার দিকে এগিয়ে আসে। ফলে হিন্দু সমাজে নবজাগরণের সূচনা হয়। রাজা রামমোহন রায়কে (১৭৭৪-১৮৩৩) এ নবজাগরণের প্রাণপুরুষ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর পরবর্তী যেসব শিক্ষিত প্রতিভাবান ব্যক্তি এ নবজাগরণের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-১৮৮৩), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মাইকেল মুধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪), রঙ্গলাল (১৮২৭-১৮৮৭), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৪),

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪), হেমচন্দ্র (১৮৩৬-১৯০৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক, সমাজ-সংস্কারক ও বিদ্বজ্জন ব্যক্তির আবির্ভাবের ফলেও হিন্দু সমাজে জাগরণের এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়।

কিন্তু বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে তখনো এমন কোন পরিবর্তন বা জাগরণ পরিলক্ষিত হয়নি। বরং নবজাগ্রত হিন্দুদের বৈরিতা, ইংরেজদের বিরূপতা এবং রাজশক্তির অসহযোগিতার কারণে বাঙালি মুসলিম সমাজ তখনো চরম হতাশা ও দৈন্যদশার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছিল। সামাজিক কর্মযোগ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা থেকে তাদের জীবন ছিল প্রায় বিচ্ছিন্ন। ফলে এ সময় তাদের মধ্যে বৈরাগ্য ভাব সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় তথা বাস্তব দিক থেকে নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত হয়ে পড়ায়, সামাজিক সকল ক্ষেত্রে শোষিত-বঞ্চিত হওয়ার ফলে এ সময় তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক বৈরাগ্যভাবেরও জন্ম হয়। বাঙালি মুসলিম সমাজে তখনও রাজা রামমোহন রায় কিংবা স্যার সৈয়দ আহমদের মতো কোন নেতার আগমন ঘটেনি। তারফলে 'বাংলাদেশে দু'একটি পরিবার ছাড়া মোটামুটি সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরেই বাংলার মুসলমানেরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেনি।' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পৃ. ১৬)।

পলাশী যুদ্ধের ঠিক একশো বছর পর ১৮৫৭ সালে 'সিপাহী বিদ্রোহ' ব্যর্থতা বরণের পর চরম বাস্তবতার নিদারুণ আঘাতে মুসলমানদের মধ্যে এ বৈরাগ্য ও নিরাসক্তভাবের অবসান ঘটতে থাকে। এরপর বাঙালি মুসলিম সমাজে ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতা ফিরে আসতে শুরু করে, শিক্ষা, সাহিত্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে থাকে। এক্ষেত্রে নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৬-৯৩) ও সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯-১৯২৮) বিশেষ অবদান স্মরণযোগ্য। নবাব আবদুল লতিফের প্রতিষ্ঠিত 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' (১৮৬৩) এবং সৈয়দ আমীর আলী 'ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৮) তৎকালীন স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত মুসলিম সমাজে বিশেষ অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে।

এভাবে দেখা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মুসলমানদের আত্মগ্লানি অপনোদন, আত্ম-সচেতনতাবোধ সৃষ্টি ও আত্মজাগরণের স্পৃহা সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ সুপ্তির অবসান ঘটিয়ে নবউত্থানের প্রথম লগ্নে তাদের মধ্যে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেতনা পরিলক্ষিত হয়। এ স্বাতন্ত্র্য জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন সাহিত্যেও তেমনি তাদের স্বকীয় ধর্মীয়বোধ, ভাব-বিষয়-উপজীব্য ও ঐতিহ্য-চেতনা ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। ভাষার ক্ষেত্রেও তাদের একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল, কিন্তু শুরুতেই তা অতটা স্পষ্ট ছিল না। বরং মীর মশাররফ

হোসেন, কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫১), মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৯-১৯৬৭), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) প্রমুখের রচনায় তথাকথিত সাধু বাংলার ব্যবহারই পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ তখন সহজসাধ্য ছিল না। অবশ্য ঐসময় মুসলিম লেখকদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন (১৮৬০-১৯২৩)। তিনিই প্রথম বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিক, যিনি সাহিত্যে প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে বাংলা ভাষায় প্রচলিত আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের ব্যবহার শুরু করেন। পরবর্তীতে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) হাতে তা অতিশয় সুস্পষ্ট ও মহিমান্বিত রূপ লাভ করে।

ঊনবিংশ শতকের এ যুগ-পরিবেশ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৮-১৯১১) সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। তিনি উনবিংশ শতকের প্রথম উল্লেখযোগ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম গদ্য লেখক। তবে গদ্য ছাড়াও কিছু পদ্য রচনায়ও তাঁর অবদান রয়েছে। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণ ও আঙ্গিকে তিনি ব্যাপক চর্চা করেছেন। কুষ্টিয়া জেলার লাহিনী পাড়া গ্রামে মশাররফ হোসেন জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের বেশির ভাগ সময়ে তিনি দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁর পূর্বে উনবিংশ শতকে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন মুসলমান লেখকের পরিচয় পাওয়া যায় না। মুনশী শেখ আজিম উদ্দীন, শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী, মুনশী নামদার, করিমুন্নেছা খানম, গোলাম হোসেন প্রমুখ মশাররফ হোসেনের পূর্বে যেসব মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁরা নামমাত্র এবং পুঁথি-রচয়িতা শ্রেণীর লেখক ছিলেন। তাই মশাররফ হোসেনের মত উঁচুমানের শক্তিশালী মুসলিম লেখকের আবির্ভাব ছিল যেমন আকস্মিক তেমনি বিস্ময়কর। তাঁর সমকালে যেসব হিন্দু সাহিত্যিক বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন, তিনি তাঁদের সমপর্যায়ভুক্ত যশস্বী সাহিত্যিক হিসাবে সমাদৃত। তাঁর গ্রন্থসংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। মশাররফ হোসেনের উপর রচিত প্রথম গ্রন্থ-রচয়িতা অধ্যাপক আব্দুল লতিফ চৌধুরীর মতেঃ 'আমরা আজ পর্যন্ত বিগত (উনবিংশ শতাব্দী) শ্রেষ্ঠ মুসলিম সাহিত্যসেবী মীর মশাররফ হোসেনের ৩৮ খানা গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি।'

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'মশাররফ রচনা সম্ভার'-এর সম্পাদক ডক্টর কাজী আব্দুল মান্নান বলেনঃ 'এখন পর্যন্ত মশাররফ হোসেনের মোট ৩৬ খানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।' এখানে মীর মশাররফ হোসেন প্রকাশিত ২৭ খানা গ্রন্থের একটি তালিকা প্রদত্ত হলোঃ ১. রত্নাবতী (উপন্যাস, ১৮৬৯), ২. গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরি সেতু (কাব্য ১৮৭৩), ৩. বসন্ত কুমার নাটক (১৮৭৩), ৪. জমিদার দর্পণ (নাটক, ১৮৭৩), ৫. এর উপায় কি? (প্রহসন, ১৮৭৫), ৬. বিষাদ সিন্ধু

(ঐতিহাসিক উপন্যাস মহরম পর্ব-১৮৮৫), ৭. সঙ্গীত লহরী (গান, ১৮৮৭), ৮. গো-জীবন (প্রবন্ধ, ১৮৮৯), ৯. বেহুলা গীতভিনয় (গদ্য-পদ্যে রচিত নাটক, ১৮৮৯), ১০. উদাসীন পথিকের মনের কথা (আত্মজৈবনিক উপন্যাস, ১৮৯০), ১১. তহমিনা (উপন্যাস, ১৮৯৭), ১২. টালা অভিনয় (প্রহসন, ১৮৯৭), ১৩. নিয়তি কি অবনতি (নাটক, ১৮৯৮), ১৪. গাজী মিয়ার বস্তানী (আত্মজৈবনিক রচনা, ১৮৯৯), ১৫. মৌলুদ শরীফ (গদ্যে-পদ্যে লেখা মিলাদ শরীফ, ১৯০৩), ১৬. মুসলমানদের বাংলা শিক্ষা (পাঠ্য পুস্তক, ১ম ভাগ, ১৯০৩), ১৭. বিবি খোদেজার বিবাহ (কাব্য, ১৯০৫), ১৮. হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ (কাব্য, ১৯০৫), ১৯. হজরত বেলালের জীবনী (কাব্য, ১৯০৫), ২০. হজরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ (কাব্য, ১৯০৫), ২১. মদীনার গৌরব (কাব্য, ১৯০৬), ২২. মোসলেম বীরত্ব (কাব্য, ১৯০৬), ২৩. এসলামের জয় (গদ্য, ১৯০৮), ২৪. মুসলমানের বাংলা শিক্ষা (২য় ভাগ), ২৫. বাজিমাত (কাব্য, ১৯০৮), ২৬. আমার জীবন (১ম খণ্ড, ১৯১০), ২৭. আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী (গদ্য, ১৯১০)

উপরোক্ত তালিকা থেকে মীর মশাররফ হোসেনের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ও তাঁর প্রতিভার বহুমুখিনতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গ্রন্থ-সংখ্যা যেমন অনেক, তাঁর সৃষ্টি-বৈচিত্র্যও তেমনি বিস্ময়কর। একাধারে তিনি উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, কবিতা, গান, প্রবন্ধ, আত্মজৈবনিক রচনা, জীবনীগ্রন্থ পাঠ্য-পুস্তক ইত্যাদি লিখেছেন। তাঁর এসব রচনায় একাধারে রয়েছে ধর্মভাব, ইতিহাস ও ঐতিহ্য-চেতনা, সমাজ-সচেতনতা, সাময়িক প্রসঙ্গ, রাজনৈতিক বিষয়, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়। সর্বোপরি মুসলমানদের উন্নয়ন ও নবজাগরণ প্রয়াসেও তিনি সর্বদা লেখনি পরিচালনা করেছেন। এত অসংখ্য বিষয়, ভাব ও অনুভূতি মশাররফ হোসেন তাঁর বিশাল সাহিত্যে এক অসাধারণ নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। এর দ্বারা তাঁর প্রতিভার বহুমাত্রিকতা ও বর্ণিলতার প্রকাশ ঘটেছে।

মশাররফ হোসনের সাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত এবং তাঁর অনুপ্রেরণা সম্পর্কে জানা যায়, ছোটবেলায় তাঁর বাড়িতে পুঁথি পাঠের আসর বসতো। তিনি ছিলেন তার একজন বিমুগ্ধ শ্রোতা। বাউল কবি লালন শাহের এলাকায় তাঁর বাড়ি হওয়ার কারণে বাউল গানের দ্বারাও তাঁর মানস-প্রকৃতি কিছুটা প্রভাবিত হয়। গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র সম্পাদক কুমারখালির কাঙ্গাল হরিনাথের পত্রিকায়ও মশাররফ হোসেন প্রতি সপ্তাহে বার্তা পরিবেশন করতেন। এছাড়া, তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ-প্রভাকর'-এও সংবাদদাতার কাজ করতেন। এভাবে পুঁথিপাঠের আসরে বসার অভিজ্ঞতা, বাউল গানের অধ্যাত্ম-চেতনা,

সংবাদপত্রের অভিজ্ঞতা এবং জমিদারের কাচারীতে কার্যরত অবস্থায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের বিচিত্র স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে। সাংবাদিক হিসাবে তিনি প্রথম জীবনে যে কাজ শুরু করেন তারই সূত্র ধরে তিনি একসময় 'আজিজন নেহার' ও 'হিতকারী' নামক দুটি পত্রিকা প্রকাশেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

মীর মশাররফের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'রত্নাবতী'। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১। গ্রন্থের কাহিনী কৃত্রিম, উপকথা জাতীয়। তবে গ্রন্থকার এটাকে কৌতুকাবহ উপন্যাস হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। গ্রন্থের ভাষা কৃত্রিম, সাধু বাংলা। যেমন-'রাজনন্দিনী যুবরাজ সুকুমারকে দর্শন করিবা মাত্র সগর্ব্বে স্বীয় সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি যুবরাজের নিকট বিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করি।' গ্রন্থটির ভূমিকায় (বিজ্ঞাপন) লেখক লিখেছেন: 'গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার নামে পরিচয় দেওয়া এই আমার প্রথম উদ্যম। অতএব, ইহার মধ্যে শত শত দোষ বিদ্যমান থাকা সম্ভব।' গ্রন্থ প্রকাশের পর 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করে: 'ইহার লেখা অতি সরল, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু উপন্যাসটিতে বিশেষ চাতুর্য কিছু প্রকাশ পায় নাই।' মীর মশাররফের এ প্রথম গ্রন্থের ভাষা ও বর্ণনায় তাঁর পূর্বসূরি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অনেকটা স্পষ্ট। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের মত উপন্যাস রচনার প্রতিভা তাঁর এ গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায় না ।

মশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'গোরাই ব্রিজ বা গৌরী সেতু'। এটি প্রকাশের পর, এর আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮৭৩ সালে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন: 'তাঁহার (মশাররফ হোসেন) রচনার ন্যায়, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়।' গোরাই ব্রিজ একটি কবিতার বই। তাই এ মন্তব্য করার সময় নিশ্চয়ই 'রত্নাবতী'র কথাই বঙ্কিম স্মরণ করে থাকবেন। তাছাড়া, মশাররফ হোসেনের কবিতার ভাষাও সহজ, প্রাঞ্জল ও সাধু প্রকৃতির। বঙ্কিমচন্দ্র তখন 'সাহিত্য সম্রাট' হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাই মশাররফ হোসেন সম্পর্কে তাঁর উপরোক্ত মন্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত হিন্দুদের নিকট তখন কোন মুসলমান সাহিত্যিক হিসাবে সহজে সম্মান পেতেন না। সেসময় বঙ্কিমের মত গোঁড়া ব্রাহ্মণ এবং চরম মুসলিম-বিদ্বেষী উঁচু দরের সাহিত্যিকের উপরোক্ত মন্তব্যকে মশাররফ হোসেনের সাহিত্য-প্রতিভার যথার্থ স্বীকৃতি বলে মনে করা যেতে পারে।

গোরাই ব্রিজ প্রকাশের পর অক্ষয়কুমার সরকার 'বঙ্গদর্শনে' লিখেছিলেন: 'গ্রন্থখানি পদ্য। পদ্য মন্দ নহে। ... মীর মশাররফ হোসেনের বাঙ্গালা

ভাষানুরাগিতা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় প্রীতিকর। ভরসা করি, অন্যান্য সুশিক্ষিত মুসলমান তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুরাগী হইবেন।'

১৮৭৩ সনেই মশাররফ হোসেনের 'বসন্ত কুমারী' ও 'জমিদার দর্পণ' নামে দু'খানি নাটক প্রকাশিত হয়। 'বসন্ত কুমারী' নাটকটি তাঁর লাহিনী পাড়ার নিজ বাড়িতে মঞ্চস্থ হয়। 'জমিদার দর্পণে'র নামকরণে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৪) 'নীল দর্পণ' নাটকের কথা হয়ত মনে জাগতে পারে। এটা অস্বাভাবিক নয়। ঐ সময় 'নীল দর্পণ' অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক ছিল। ১৮৬৩ সালে Nil Durpon, or the Indigo Planting Mirror' নাম দিয়ে A Native-এ ছদ্মনামে এর ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে তখন ইংরাজ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে কৃষক সাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। নীলকরগণ বিনা পয়সায় কৃষকের জমি জবরদস্তি দখল করে, কৃষকদেরকে বিনা পয়সায় সেখানে নীল চাষে বাধ্য করে। নীল উৎপাদনের পর নীলকরগণ তা বিক্রি করে প্রচুর পয়সা রোজগার করে। কৃষকগণ তাতে কোন ফায়দা বা অংশ পায় না। কৃষকের জমি, শ্রম, কষ্ট এতে লগ্নী হলেও এর দ্বারা তাদের কোন উপার্জন হয় না। ফলে সারা বছর তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে না খেয়ে উপোস করে। এর প্রতিবাদ করতে গেলেও নীলকরদের লাঠিয়াল বাহিনী তাদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালায়। এ দুঃসহ ও মর্মান্তিক কাহিনী নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীল দর্পণ' নাটক রচনা করেন। এ নাটক প্রকাশের পর ইংরেজ সরকারের টনক নড়ে এবং তারা আইন করে নীল চাষ বন্ধ করে দেয়।

'নীল দর্পণে'র এরূপ জনপ্রিয়তা দেখে মশাররফ হোসেন হয়ত 'জমিদার দর্পণ' নাটক লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু এর ভাব ও বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে জমিদার কাচারীতে। তাই জমিদারের স্বভাব-প্রকৃতি ও জীবন-বৃত্তান্ত তাঁর বিশদরূপে জানা ছিল। 'জমিদার দর্পণ' নাটকে তাঁর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার রূপায়ণ ঘটেছে। এতে তাঁর সমাজমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। মূলত মশাররফ হোসেনের অধিকাংশ সাহিত্যই তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার প্রতিবিম্ব।

১৮৭৬ সালে রচিত 'এর উপায় কি' মশাররফ হোসেনের একটি প্রহসন। ইতঃপূর্বে রচিত মধুসূদনের 'একেই বলে সভ্যতা' ও 'বুড়া শালিকের ঘাড়ে রোঁ' দুটো প্রহসনের খানিকটা প্রভাব এতে থাকলেও ভাব-বিষয় ও রচনা-শৈলির দিক থেকে এটা স্বতন্ত্র।

মশাররফ হোসেনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'বিষাদ সিন্ধু'। ১৮৮৫-১৮৯১ পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বছরে মোট তিন খণ্ডে রচিত বিপুলায়তন 'বিষাদ সিন্ধু' তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে

নিয়ে যায়। এ ঐতিহাসিক উপন্যাসটি মশাররফ হোসেনকে বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী অমরতা দান করেছে। এটি বাংলা ভাষায় সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি। এক সময় বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানের প্রায় প্রতিটি ঘরেই 'বিষদ সিন্ধু' শোভা পেত এবং বিশেষভাবে মহরম মাসে আসর করে এটি পাঠ করা হতো। 'বিষাদ সিন্ধু'র প্রথম পর্ব প্রকাশের পর 'ভারতী (ফাল্গুন, ১২৯৩) পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়: 'ইহা মহরমের একখানি উপন্যাস ইতিহাস। ইহার বাঙ্গালা যেমন পরিষ্কার, ঘটনাগুলি যেমন পরিস্ফুট, নায়ক-নায়িকার চিত্রও ইহাতে তেমনি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে একজন মুসলমানের এত পরিপটি বাঙ্গালা রচনা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।' 'বিষাদ সিন্ধু' সম্পর্কে 'গ্রাম বার্তা প্রকাশিকায়' (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২) লেখা হয়: 'ইহার এক একটি স্থান এরূপ করুণ রসে পূর্ণ যে, পাঠকালে চক্ষের জল রাখা যায় না। যাহারা মুসলমানদিগের মহররম পর্বের বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, অনুরোধ করি, তাহারা বিষাদ সিন্ধু পাঠ করুন মনোরথপূর্ণ হইবে। মুসলমানদের গ্রন্থ এইরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গ ভাষায় অল্পই অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।'

'বিষাদ সিন্ধু' সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান বলেন: "পুঁথি সাহিত্যে মহরমের কাহিনী ইতঃপূর্বেও প্রচলিত ছিল। 'মুক্তাল হোসেন', 'জারী জঙ্গনামা' প্রভৃতি পুঁথি মশাররফ হোসেনের বহু পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। সুতরাং 'বিষাদ সিন্ধু'র গল্প এমন কিছু নূতন নয়। তবে তাহা মশাররফ হোসেনই সর্ব প্রথমে সাধু ভাষায় সঙ্কলন করেন। অবশ্য চরিত্র চিত্রণের মধ্যেও বহু স্থানে তাঁহার মৌলিকতা প্রকাশ পাইয়াছে।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, তৃতীয় প্রকাশ, প্রকাশক-বাংলা সাহিত্য পরিষদ, অক্টোবর, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৫১৫)।

'বিষাদ সিন্ধু' ইতিহাস-ভিত্তিক উপন্যাস হলেও এতে ইতিহাসকে হুবহু অনুসরণ করা হয়নি। উনবিংশ শতকে ইসলামী ভাব ও মুসলিম পুনর্জাগরণের যে উদ্দীপনাপূর্ণ প্রয়াস সমকালীন মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল, মীর সাহেবের রচনায় তার সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষণীয়। 'বিষাদ সিন্ধু' এর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। 'বিষাদ সিন্ধু'কে যেমন উপন্যাস বলা মুস্কিল, তেমনি একে ইতিহাস গ্রন্থ বলাও চলে না। কারণ পাঠকের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইতিহাসের কিছুটা অপলাপ ঘটিয়ে নিজস্ব কল্পনা ও কিছুটা অতিশয়োক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। অন্যদিকে, আধুনিক উপন্যাসের শিল্প-রীতিও এতে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা হয়নি। তবে এটাকে মধ্যযুগীয় পুঁথি সাহিত্যের ঢং-এ আধুনিক উপন্যাসের ভঙ্গীতে রচিত ইতিহাসাশ্রয়ী রচনা বলা যেতে পারে। কাহিনী, চরিত্র, ভাষা ও বর্ণনার গুণে এটা এক অসাধারণ পাঠকপ্রিয় গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসের এক বিষাদ-করুণ ঘটনাকে লেখক মানবিক সংবেদনা ও আর্তিতে পূর্ণ করে অপরূপ বর্ণনা ও চরিত্র-চিত্রণের আশ্চর্য কুশলতায় 'বিষাদ সিন্ধু'কে এক অবিস্মরণীয় গ্রন্থে পরিণত করেছেন। এটা বাংলা সাহিত্যের এক সফল ক্লাসিক গ্রন্থ এবং মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

'বিষাদ সিন্ধু'র আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর অপরূপ বাক-বিন্যাস। অলংকারপূর্ণ ভাষা, চিত্তাকর্ষক বর্ণনা, আবেগ-উচ্ছ্বাসপূর্ণ সুরময় স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ও নৈপুণ্যময় বাক-বিন্যাস 'বিষাদ সিন্ধু'কে এক অপরূপ কাব্য-মহিমা দান করেছে। ঘটনা ও কাহিনীর দিক থেকে এটাকে মহাকাব্যধর্মী বলা চলে। মহাকাব্যের ধ্রুপদ বৈশিষ্ট্য এতে বহুলাংশে বিরাজমান। তাই সবকিছু মিলিয়ে 'বিষাদ সিন্ধু' বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ ব্যতিক্রমী গ্রন্থ। গদ্য, পদ্য, ইতিহাস, উপন্যাস, মহাকাব্য, বাস্তবতা ও কল্পনার এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে এখানে।

'বিষাদ সিন্ধু'র মত 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য়ও উপন্যাসের শিল্পরীতি যথাযথ নিষ্ঠার সাথে অনুসৃত হয়নি। এ জাতীয় রচনায় ঘটনা, কাহিনী ও চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষেত্রে লেখকের যতটা আন্তরিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, উপন্যাসের প্রকৃতি ও শিল্পরীতির প্রতি লেখকের ততটা সজাগতা লক্ষ্য করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, উপন্যাসের ঢং-এ লেখা হলেও এটা উপন্যাস নয়, নীলকর সাহেবদের জুলুম-নির্যাতনের মর্মন্তুদ কাহিনীতে পূর্ণ এক বাস্তব উপাখ্যান। লেখক নিজেই এখানে উদাসীন পথিক। ক্যানি সাহেব তার জমিদারীতে কীভাবে প্রজাসাধারণের উপর জুলুম করে ধানের বদলে নীলের চাষ করাতো, কীভাবে প্রজাদেরকে কুঠি পাহারায় নিয়োজিত করতো, অন্যান্য জমিদারগণ তার অত্যাচার থেকে প্রজাদেরকে বাঁচাবার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে, প্রজা-বিদ্রোহ, গভর্নরের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি নানা ঐতিহাসিক বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে এখানে কাহিনীর পত্র-পল্লব বিকশিত হয়েছে। কাহিনী যেমন বাস্তবধর্মী, ভাষা ও বর্ণনা কৌশলে সাধারণ পাঠকের নিকট তেমনি তা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সমকালীন সমাজের এক বাস্তব চিত্র এ গ্রন্থে বিশ্বস্ততার সাথে বিবৃত হয়েছে।

'গাজী মিয়ার বস্তানী' মীর মশাররফ হোসেনের আর এক বিস্ময়কর বিশালকার সৃষ্টি। এতে সর্বমোট ২৪টি নথি বা অধ্যায় রয়েছে। প্রথম খণ্ডে ২০টি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ৪টি নথি সন্নিবেশিত হয়েছে। এটাকেও ঠিক উপন্যাস বলা যায় না, কালিপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচার নক্সা'র মত এটা একটি নক্সা জাতীয় রচনা। এতে এত বিচিত্র ধরনের ঘটনা, কাহিনী ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে যে, লেখক এ গ্রন্থে তাঁর নাম দিতে শংকা বোধ করেছেন। গ্রন্থের উপরে লেখা ছিল,

‘স্বত্বাধিকারী উদাসীন পথিক’। অনেকে এটিকে মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে করেন। জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে যদিও এটা ‘বিষাদ সিন্ধু’র সমকক্ষ নয়, কিন্তু বিষয়-বৈচিত্র্য, চরিত্র-চিত্রায়ণ, সমাজ-বাস্তবতার সার্থক উপস্থাপন ও শিল্প-সম্ভাবনার দিক থেকে এটা তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং বাংলা সাহিত্যেরও এক মূল্যবান সম্পদ, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অক্ষয়কুমার মৈত্রের মতেঃ ‘গাজী মিয়ার বস্তানী’ একখানি বিচিত্র সমাজচিত্র সুশোভিত, সুলিখিত উপন্যাস। ইহাতে নাই এমন রস দুর্লভ।”

নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান ‘গাজী মিয়ার বস্তানী’র কাহিনীর পরিচয় দিয়েছেন এভাবেঃ “গল্পের আরম্ভ বা ‘বস্তানী শুরু’-অরাজকপুরের হাকিম ভোলানাথ, কুঞ্জনিকেতনের বিধবা বেগম পয়জারুন্নেসাকে লইয়া। দ্বিতীয় নথিটিতে ‘সবলেট চৌধুরী’র কথা। বস্তানী প্রথম হইতে শেষ এমনি হালকা কথায় অনেকটা ‘হুতোম পেঁচার নক্সা’র রীতিতে লেখা। ইহা উনবিংশ খৃস্টাব্দের পর্যন্ত মুসলিম পতন যুগের সামাজিক চিত্র। অবশ্য সমাজের সব স্তরের চিত্র ইহাতে তেমন প্রতিফলিত হয় নাই যেমন হইয়াছে জমিদার, লম্পট ও অসৎচরিত্রের ছায়াপাত। ‘হুতোম পেঁচার নক্সা’, ‘আলালের ঘরের দুলাল’ আর ‘গাজী মিয়ার বস্তানী’ অনেকটা এক জাতীয় নক্সা’ ঠিক সেই অনুপাতে বাস্তবভিত্তিক কিনা স্থির নিশ্চয় হইয়া বলিবার উপায় নাই। ‘গাজী মিয়ার বস্তানী’ও একটি ‘জমিদার দর্পণ’। মোগল অধিকারের পর মৈমনসিংহের অনেক পাঠান জমিদার বহুকাল পর্যন্ত মধুপুরের জঙ্গলে গোপনে বাস করিতেন।... মশাররফ হোসেন এই জমিদারের চরম পতনের যুগ দেখিয়াছেন এবং তাহাদের চিত্র আঁকিয়াছেন।...

“... উপন্যাস হিসাবে ইহা যে বিশেষ উঁচুদরের তাহা বলিবার উপায় নাই। কারণ ইহাতে ঘটনা অনেক থাকিলেও সবগুলি এক সূতায় গ্রথিত হইয়া জমাট বাঁধে নাই। অনেক কথা রাখিয়া-ঢাকিয়া বলিতে হইয়াছে। অনেক কথা অপ্রকাশ থাকিয়া গিয়াছে। তাছাড়া বস্তানীকে কাহিনী করিয়া তুলিবার দিকে লেখকের তেমন দৃষ্টি ছিল না। ... বস্তানীতে ঘটনা অনেক থাকিলেও ঘটনার ভিতর দিয়া চরিত্র ফুটিয়া উঠে নাই। চরিত্র সৃষ্টি হইয়াছে লেখকের বর্ণনায়, ধিক্কারে, অতিশয়োক্তিতে; নানা কাজের ভিতরে নানা আবেষ্টনীর সংঘাতে এ চরিত্র আপনা হইতেই পরিস্ফুট হয় নাই। ইহাতে কল্যাণবোধ আছে কিন্তু তাহা স্থূল, মানসতা ও মননশীলতা গভীর হইতে উদ্ভুত নয়। তবু যে এ গ্রন্থ মর্মস্পর্শী তাহার কারণ রসানুভূতি নয়- সামাজিক কল্যাণবোধ।” (নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানঃ ঐ, পৃ. ৫১৬, ৫১২)

মীর মশাররফ হোসেনের 'সঙ্গীত লহরী', 'গোজীবন', 'বেহুলা গীতাভিনয়', মৌলুদ শরীফ' প্রভৃতি কাব্য, প্রবন্ধ, গীতিনাটক, নাত-এ রাসূল ইত্যাদির মধ্যে একাধারে তাঁর প্রতিভার বহুমুখিতা এবং প্রেম ও মরমী ভাবের প্রকাশ লক্ষণীয়।'

মশাররফ হোসেনের সমগ্র সাহিত্য-কর্মকে মোটামুটি সাত ভাগে ভাগ করা যায়:

এক. উপন্যাস জাতীয় রচনা। রত্নাবতী, বিষাদ সিন্ধু, উদাসীন পথিকের মনের কথা, তহমিনা এ শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থ।

দুই. আত্মচরিতমূলক রচনা। গাজী মিয়ার বস্তানী, আমার জীবন, আমার জীবনীর জীবনী, কুলসুম জীবনী প্রভৃতি এ শ্রেণীভুক্ত। অবশ্য গাজী মিয়ার বস্তানী উপন্যাসের ঢং-এ লেখা আবার উদাসীন পথিকের মনের কথাও বহুলাংশে আত্মজীবনীমূলক রচনা।

তিন. নাটক। বসন্ত কুমারী নাটক, জমিদার দর্পণ, বেহুলা গীতাভিনয়, নিয়তি কি অবনতি এ শ্রেণীর অন্তর্গত।

চার. প্রহসন। এর উপায় কি? টালা অভিনয় এ শ্রেণীভুক্ত।

পাঁচ. কবিতা ও গান। গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরি সেতু, মৌলুদ শরীফ, বিবি খোদেজার বিবাহ, হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ, হজরত বেলালের জীবনী, হজরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ, মদীনার গৌরব, মোসলেম বীরত্ব, এসলামের জয়, বাজিমাত ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ।

ছয়. প্রবন্ধ। গো-জীবন মশাররফ হোসেনের একমাত্র প্রবন্ধ গ্রন্থ।

সাত. পাঠ্য-পুস্তক। মুসলমানের বাংলা শিক্ষা ১ম ভাগ, মুসলমানের বাংলা শিক্ষা ২য় ভাগ তাঁর পাঠ্য-পুস্তক জাতীয় রচনা।

মশাররফ হোসেনের রচনায় মোটামুটি তিনটি বিষয় প্রাধান্য লাভ করেছে।

১. ধর্মীয় ভাব, মুসলিম ঐতিহ্য ও ইতিহাস চেতনা।

২. স্বদেশ-প্রীতি, সমাজ-সচেতনতা, সমাজ-সংস্কার ও কল্যাণবোধ।

৩. মানবিক প্রেম ও মরমী সংবেদশীলতা।

উনবিংশ শতকের সকল মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের রচনায় এ বিষয়গুলো লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি, মানবিক সংবেদনা ও লাঞ্ছিত-দুর্দশাগ্রস্ত সমাজের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও কল্যাণকামিতা তাঁর রচনার কেন্দ্রীয় ভাব।

মশাররফ হোসেনের সমকালে একদিকে বিদেশী শাসকের শোষণ, নীলকর সাহেবদের হৃদয়হীন পীড়ন এবং অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শক্তির দেশীয় প্রতিভূ নব্য জমিদার ও সামন্ত প্রভুদের অমানুষিক অত্যাচার, উপরন্তু উকিল-মোক্তার,

পেশকার-ফরিয়া, পাইক-পেয়াদা-মুৎসুদ্দি, বরকন্দাজ ইত্যাদি শ্রেণীর অসৎ-বাটপার লোকদের শোষণ-জুলুমে সমাজের সাধারণ মানুষের জীবন তখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মশাররফ হোসেনের দরদী মন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ নিগৃহীত মানবতার বিচিত্র করুণ চিত্র অঙ্কন করেছে। সমাজের বিভিন্ন দুর্বলতা, স্খলন-পতন ও অন্যায়-অবিচারের কথা বিচিত্র রস ও ভঙ্গীতে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে মশাররফ হোসেনের আশ্চর্য কুশলতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম গদ্য-লেখক মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য প্রতিভা। তাঁর বিচিত্র অবদান বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ। ভাষার ক্ষেত্রে তিনি বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের গদ্য-রীতির অনুসরণ করলেও শিল্প-রীতির ক্ষেত্রে তিনি কোন বিশেষ ব্যক্তিকে অনুসরণ করেননি। তবে টেকচাঁদ, বঙ্কিম, কালীপ্রসন্ন, দীনবন্ধুর কিছু কিছু প্রভাব ক্ষেত্র বিশেষে মশাররফ হোসেনের উপর লক্ষণীয়। তা সত্ত্বেও প্রায় সর্বক্ষেত্রে তাঁর নিজস্বতাও অনেকটা স্পষ্টগ্রাহ্য। মশাররফ হোসেনের অনেকগুলো গ্রন্থ বিংশ শতকের প্রথম দিকে রচিত হলেও তাঁর প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলো উনবিংশ শতকে রচিত। তাছাড়া, তাঁর মানস-প্রকৃতি ও চিন্তা-চেতনা সবকিছুই উনবিংশ শতকের সমাজ পরিবেশ ও আবেগ-অনুভূতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এ দিক দিয়ে যথার্থ অর্থেই তিনি উনবিংশ শতকের লেখক এবং নিঃসন্দেহে উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম গদ্য-শিল্পী, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। গদ্য রচনার দিক দিয়ে তাঁর সমকালে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সাথেই তাঁর তুলনা চলে।♦

লেখক : প্রফেসর ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ